মুহাম্মাদ হোসাইন

প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রার এক ‘বাহন’—এতে কোনো সন্দেহ নেই; একই সাথে এও তো অনস্বীকার্য যে, এই বাহনের মুখে লাগাম থাকতে হবে। সে লাগাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সংযম ও সচেতনতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের সমাজে এ জিনিসের বড্ড অভাব।

প্রযুক্তির সাথে প্রথম প্রণয়ের ঘোর এখনো কাটেনি—তা যেন কাটতেই চায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আরও ক্ষতি হওয়ার আগে এই অশুভ ঘোর আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

-মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ (হাফিযাহুল্লাহ)

স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের মায়াজালে আচ্ছন্ন

কল্পিত কারাবাস

স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের মায়াজালে আচ্ছন্ন

কল্পিত কারাবাস

মুহাম্মাদ হোসাইন

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا

আধুনিক জীবনের এক প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ প্রযুক্তি। শিক্ষা-দীক্ষা, যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই তা অভাবনীয় গতি এনে দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে তা কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা এবং খুলে দিয়েছে মেধা ও সময়ের ভয়াবহ অপচয়ের দুয়ার। প্রযুক্তি এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের জীবন ও ভবিষ্যতের জন্য; অনেক পরিবারের স্থিতি ও স্বস্তির জন্যও। উদ্বেগের ব্যাপার হলো, এ বিষয়ে সামাজিকভাবে সতর্ক হওয়ার গরজ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। এখনো অনেক মা-বাবা সরল শখের বশে ছেলেমেয়ের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেন। তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একটিমাত্র স্মার্টফোন তাদের সন্তানের কী অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রার এক 'বাহন'—এতে কোনো সন্দেহ নেই; একই সাথে এও তো অনস্বীকার্য যে, এই বাহনের মুখে লাগাম থাকতে হবে। সে লাগাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সংযম ও সচেতনতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের সমাজে এ জিনিসের বড্ড অভাব।

প্রযুক্তির সাথে প্রথম প্রণয়ের ঘোর এখনো কাটেনি—তা যেন কাটতেই চায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আরও ক্ষতি হওয়ার আগে এই অশুভ ঘোর আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

সুখের বিষয়ে এই যে, সংখ্যায় কম হলেও আমাদের দ্বীনপ্রিয় ও দ্বীনমুখী শিক্ষিত তরুণদের একটি অংশ সচেতন হয়ে উঠছেন এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বিস্তারের প্রেরণা যোগ করছেন। এটি শুভলক্ষণ। আর আশা করি, সামাজিকভাবে আমাদেরও ঘুম ভাঙার পূর্বলক্ষণ ইনশাআল্লাহ।

এখন পাঠকের হাতে যে বইটি, তা আমার কাছে এই সচেতনতারই একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে। বইটিতে লেখকের দরদ ও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ!

আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বীনমুখী তরুণ ভাইয়েরা যদি পশ্চিমা জীবনধারার নানা ক্ষত ও বিকৃতি সম্পর্কে—যা দুঃখজনকভাবে আমাদের মুসলিম-সমাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে—আলোচনা শুরু করেন, তাহলে তা হয়তো সমাজের দ্বিধা ও জড়তা কাটাতে সহায়ক হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা প্রিয় লেখকের এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন। দাওয়াত ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে তাকে আরও অগ্রসর করুন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ
সহ-সম্পাদক : মাসিক আলকাউসার।
নায়েবে মুশরিফ : দাওয়াহ বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ
আলইসলামিয়া, ঢাকা।
খতিব : উত্তরা ৭ নং সেক্টর জামে মসজিদ।

লেখকের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে দীর্ঘ অপেক্ষার পর কল্পিত কারাবাস বইটির কাজ শেষ করা সম্ভব হলো। এমন সময় অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেই মহান রবের শুকরিয়া আদায় করছি, যার তাওফীক ছাড়া কাজটি করা সম্ভব হতো না—আলহামদুলিল্লাহ!

বিরূপ পরিবেশে থাকতে থাকতে একটা সময় মানুষ সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একজন নেককার মানুষও কোনো কারণে কিছুদিন গুনাহের পরিবেশে থাকলে ধীরে ধীরে এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পর্দানশীন মানুষ বেপর্দা পরিবেশে অবস্থান করলে তার পর্দা-অনুভূতি লোপ পেতে থাকে। একসময় সব স্বাভাবিক মনে হয়। ইন্টারনেটের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও যখন একজন মানুষ সময় কাটাতে থাকে, ধীরে ধীরে অশ্লীলতা, মিউজিক ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাজা অনুভূতিও দ্রুতই মরে যায়।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সাথে এতদিনের সম্পর্কের পর এখন নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে—স্মার্টফোন কি বাস্তবেই আমার জন্য জরুরি? কতটা জরুরি? নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে—আমার সন্তানের হাতে কেন আমি এই ভয়াবহ ডিভাইস তুলে দিচ্ছি, যেখানে কিশোর-তরুণদের বড় অংশ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত?

একান্ত যারা অনলাইন-কেন্দ্রিক পেশায় জড়িত, তারা ছাড়া বাকিরা নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দুনিয়া-আখিরাত নিরাপদ রাখতে চাইলে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিন্তা করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ, এই আত্মঘাতী অভ্যাস আমাদের ঈমান ও চরিত্রকে শেষ করে ফেলছে। রক্ষণশীলতা আর পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই বইতে বিভিন্ন সময় আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করা সমস্যাগুলোকে বিন্যস্ত করে তুলে ধরা হয়েছে কেবল। এতে এমন কিছু হয়তো

পাওয়া নাও যেতে পারে, যা আমরা মোটেই জানি না। তবে একসাথে পুরো আলোচনাটা হয়তো আমাদের কিছুটা হলেও ভাবাবে।

বইটি লেখার সময় অনেক মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। বিশেষ করে মাওলানা ইউসুফ ওবায়দী সাহেব পুরো লেখাটা খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার উত্তম বিনিময় আল্লাহ্ তাকে দান করুন। এ ছাড়া বেশ কয়েক জন মুহসিন আলেমের কাছে ফাইলের ড্রাফট কপি পেশ করেছি। অনেক আন্তরিক পরামর্শ পেয়েছি। এটাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

আমার ওপর হযরত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ সাহেবের যে এহসান ও ভালোবাসা তা নিঃসন্দেহে আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার বড় এক দান। বিভিন্ন সময় তাঁকে অনেকভাবে বিরক্ত করলেও তিনি তা হাসিমুখে মেনে নেন। এর একটি উদাহরণ হলো বইটির ড্রাফট কপি পেশ করার পর শত ব্যস্ততার ভেতরেও হুজুর মূল্যবান একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

আমার পরিবারের লোকজন-সহ অনেক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম আমাকে, আমার পরিবারকে ও পাঠকবৃন্দকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রিয় প্রকাশনী শব্দতরু আমার দুর্বল হাতের এই লেখা ছাপার ঝুঁকিপূর্ণ সাহস দেখিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এই প্রকাশনী-সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া-আখিরাতে নিরাপত্তা দান করুন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হোসাইন
মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা।
১০ জিলকদ ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক
০১ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়সূচি

অবাক সরলতা / ১১
এ তো আমাদেরই আয়না / ১৭
এ ক্ষতিগুলো শুধু ক্ষতি নয় / ২৮
অনলাইনে দাওয়াত ও অপ্রশান্ত অন্তর / ৪২
স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে দূরে গেলে নগদ প্রাপ্তি / ৪৮
এ আসক্তি থেকে বাঁচার উপায় / ৫৫
শেষ কথা / ৬৯

০১.

অবাক সরলতা

রাজধানীর কোনায় থাকা উত্তরখানের একটা নীল আকাশের নিচে আমরা শৈশব-কৈশোর পার করেছি। যেখানে বাবা-মায়ের ভয় শুধু এটাই ছিল, সন্তান হারিয়ে না যায়, ছেলেধরা ধরে নিয়ে না যায়। যদি বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো সন্তানের সাথে আরেকটু বড় কোনো ছেলে থাকত, তখন সে ভয়টুকুও থাকত না।

আমরা সুতোছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে মাইলের পর মাইল দৌড়েছি। অনেক দূরের প্রাইমারি স্কুলে একা একা যেতে কুকুর ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর ভয় কখনো করিনি। আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন নিয়ে দিনরাত এক করেছি। দূরের বিলে শাপলা তুলতে গিয়েছি। বর্ষার শেষে ধানখেতে দইয়ের মতো তরল আর চকোলেটের মতো কালো কাদায় হাঁটু গেড়ে মাছ ধরেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকের মাছ ধরা দেখার সুখ আস্বাদন করেছি। সন্ধ্যায় মাঠের ধারে শত শত মশার আস্তানায় 'জিম্মম্মম্ম...' শব্দ করে মশাগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে অনাবিল আনন্দ পেয়েছি। পশ্চিম পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সাথে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেয়া মিনি লড়াই ও ক্রিকেট চ্যালেঞ্জের মধ্যেও থাকত টানটান উত্তেজনা।

কৈশোরে আমার ব্যক্তিগত একটা বিনোদন ছিল পাখির গানে ডুব দেয়া। আমাদের জাম গাছের নিচে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। সেই বেঞ্চের ওপর চুপচাপ শুধু বসে থাকা। এক মিনিট, দুই মিনিট করে ডুব দিয়ে থাকা। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আরও গভীরে যাওয়া। আরও—আরও। এ পর্যায়ে আমি আমার জামতলার বেঞ্চটাতে আর নেই। আমি এখন অন্য এক ভুবনে। এখানে শুধু পাখির গান আছে আর শুধু পাখির গানই আছে। আর কিছু নেই। কাছের-

দূরের বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন রকম ডাকে আমি নিমজ্জিত। জগতের আর কোনো কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এখান থেকে বের হওয়া যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠা। ওই জগৎ থেকে এই জগতে প্রত্যাবর্তন।

যেকোনো সময় প্রত্যেক মা তার সন্তানকে খুঁজে পেতে নাম ধরে শুধু একটা গগনবিদারী চিৎকার দিতেন। ব্যস। কলকারখানা বিহীন শান্ত এলাকার ইথারে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ত সে ডাক। ছেলে ফিরবেই। সন্তান বাবা-মায়ের নাগালের মধ্যেই থাকবে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পার হয়েছে। এই পৃথিবীর চালচিত্র বদলেছে অনেকটাই। টেলিভিশন আর টেলিফোন তো আগেই ছিল। যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে এল মোবাইল ফোন। যা এসেছিল আলাভোলা এক চেহারা নিয়ে। যার ভবিষ্যৎ ক্ষমতা সম্পর্কে সবার মাঝে ছিল বড্ড ভুল ধারণা। ধারণাটা ছিল নিরীহ গোছের। যদিও তা পরে আর তেমনটা থাকেনি। এখানে মূল সমস্যাটা সামাজিক যোগাযোগের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ও ভুল ব্যবহার। এর পরিমিত ব্যবহার খুব বেশি ক্ষতিকর ছিল না; বরং উপকারীই ছিল বড়। কিন্তু সীমা অতিক্রম করার পর এর আসল ক্ষতিটা নজরে এল।

এখন সন্তান ঘরেই থাকে। থাকে চোখের সামনে। কিন্তু তবুও নাগালের বাইরে। বাবা-মায়ের কল্পনাকে হার মানিয়ে এমন-সব ভ্রমণ তারা করে, যা প্রকাশ পাওয়ার পর মা-বাবার আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতাটুকুও থাকে না। ২০১৩ সালে রাজিব হায়দার ওরফে থাবা-বাবার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন হয়তো আশ্চর্যও হতে পারেনি। আমাদের সমাজে এমন অনেক 'ভালো ছেলে' আছে, যারা অনলাইনে নিয়মিত রগরগে বাজে গল্প লেখে। যাদের খবর কখনো প্রকাশিত হয় না। হয়তো কখনো ফাঁস হয়, কিন্তু এতে কার কীই-বা আসে-যায়! সন্দেহের বীজ বুকে নিয়ে বেড়ে ওঠা 'মাওলানা' তলে তলে হয়ে ওঠে নাস্তিকদের নবী, ফেঁদে বসে 'আমার অবিশ্বাস'।

এমন দিন কখনো আসবে তা কেউ হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি। সব ভাবনাকে এড়িয়ে, গতিতে ক্ষিপ্র হয়ে, সব রক্ষণশীলতা আর লাজ-শরমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বীরদর্পে এই বিপদ চলেই এল। এসে পাকাপাকি একটা

জায়গা দখল করেই নিল। এমন স্বৈরশাসকের মতো অবস্থান নিল, যার সরাসরি সমালোচনা করা যায় না। চোখে চোখ রাখা যায় না। এই বিপদে পা পিছলে যাওয়া মানুষটাকে সরাসরি ফেরানো যায় না। সামাজিকভাবে চোখ রাঙানো যায় না এই বিপদের পথে রওনা হওয়া মানুষটাকে।

আহা, এও হওয়ার ছিল! এই দিনও দেখার ছিল! ১৫ বছর আগেও তো আমাদের জীবনটা এমন ছিল না। যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। কিন্তু এই খারাপটা এমন খারাপ হবে তা তো ভাবনারও অতীত ছিল।

মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট—সত্তাগতভাবে তো এর কোনোটাই খারাপ না। এতে অনেক উপকারও আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এখানে বিপদটা আসলে কী? স্মার্টফোন? ইন্টারনেট? না। এগুলো সরাসরি বিপদ নয়। বিপদের কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান এমন :

- প্রয়োজন ছাড়া ইন্টারনেটের ব্যবহার।
- ইন্টারনেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসা অশ্লীলতা, যা থেকে বাঁচার পথ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জানা নেই।
- ব্যাপক ও সহজ যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক যোগাযোগগুলোও শামিল।
- অশ্লীলতার সহজলভ্যতা।

এরচেয়ে বড় বিপদটা হলো, অশ্লীলতাকে মেনে নেওয়া। স্বীকার করে নেওয়া যে, এটা স্বাভাবিক। এ থেকে বাঁচার উপায় নেই। এসব মেনে নিয়েই এই জগতে থাকতে হবে। একে মোটাদাগে খারাপ মনে না করা।

একটা সময় ছিল, সৌভাগ্যবশত সময়টা এখনো পার হয়ে যায়নি, কোনো দ্বীনদার, নেককার, আল্লাহওয়ালা বা মসজিদের ইমাম সাহেবের ঘরে টিভি থাকাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করা হতো। যেসব মানুষের নিজের ঘরে টিভি আছে তারাও এটা মানতে পারত না যে, ইমাম সাহেবের ঘরে বা একজন

দ্বীনদার ব্যক্তির ঘরে টিভি থাকবে। কারণ, টিভির সাধারণ প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ধারণা আছে। তাই তারা মেনে নিতে পারত না যে, একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিও তার মতো অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকবে।

এখানে এসে আমাদের আলোচ্য বিপদ দারুণভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। একজন মানুষ স্মার্টফোন চালাবে এতে দোষের কিছু নেই। একজন মানুষ স্মার্টফোনে ইন্টারনেট চালাবে এতেও আপাতদৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। সমাজ এই স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে। যদিও একজন মানুষ স্মার্টফোনের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ে ডুবে যাবে তা সমাজ ভালোভাবে দেখবে না।

কিন্তু একজন মানুষ যখন ইন্টারনেটের সহজলভ্য অশ্লীলতাকে হাতের কাছে পাবে, তখন কেউ কি তাকে বাধা দেবে এই চরম আকর্ষণীয় সরোবরে ডুব দেওয়া থেকে? না, দেবে না! তার মানে এই মানুষটার দ্বীন ও জীবনের জন্য অবাধ ইন্টারনেট ব্যবহারের এই অভ্যাস নিরাপদ না। এটি এমন এক বিপদ, যা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে তার দ্বীনদারী আর ঈমানকে।

অথচ কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। কেউ খারাপও বলছে না। বোঝাচ্ছে না। এমনকি এর মাঝে কোনো নেতিবাচকতাও দেখা হচ্ছে না। যদিও স্মার্টফোন চালালেই কাউকে গুনাহে লিপ্ত ভাবার কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু একজন মানুষ গুনাহের প্রবল সম্ভাবনাকে পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরিবারের সামনে সারাদিন এতে বুঁদ হয়ে থাকছে, দরোজা বন্ধ করে মোবাইলে ডুবে যাচ্ছে, ঘুমানোর সময় গভীর রাত পর্যন্ত এতে ব্যস্ত থাকছে, অথচ এরপরও এই বস্তুটি নিয়ে পরিবার ও সমাজ কোনোভাবে চিন্তিত না! এটা কি অসাবধানতা নাকি নির্লিপ্ততা? এই নির্লিপ্ততার স্বপক্ষে কি কোনো শক্তিশালী যুক্তি আছে? পরিসংখ্যান তো এর পক্ষে বলছে না; বরং পরিসংখ্যান বলছে, সিংহভাগ যুবক-যুবতী সামাজিকভাবে অনুমোদিত মধ্যম মাত্রার অশ্লীলতা শুরু করে চূড়ান্ত মাত্রার ওইসব ব্যাপারেও অভ্যস্ত, যা এই বোধশক্তিহীন সমাজও বৈধতা দেয় না। এই অভ্যস্ত মানুষগুলোর বাইরে অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের অশ্লীলতার চর্চা আসক্তির পর্যায়ে না গেলেও কখনো-সখনো এতে মজে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হলো, এই শ্রেণিও সামাজিকভাবে বৈধকৃত মধ্যম

মাত্রার অশ্লীলতায় আসক্ত। এটা তাদের নিয়মিত চর্চার বস্তু। এতে তাদের মাঝে বিশেষ কোনো পাপবোধ কাজ করে না।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দ্বীনদার লোকজনের অবস্থা কেমন? যদি বাস্তবতা স্বীকার করি, তাহলে দুঃখের সাথে বলতে হবে, ওপরে আলোচিত শ্রেণির মতো বানের জলে ভেসে যাওয়া অবস্থা না হলেও 'দ্বীনদার' লোকজনের মাঝেও ইচ্ছাকৃত, প্ররোচিত, অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীলতায় শরীক হওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

যেটা অতীতে কল্পনা করা যায়নি সেটা আজ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। যারা অনলাইনে বিভিন্নভাবে দ্বীনী দাওয়াত ও দ্বীনী পরামর্শদানের সাথে জড়িত, তাদের অভিজ্ঞতা হলো, প্রচুর দ্বীনদার মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এসবে জড়িত। অনেকেই ফেইক আইডি থেকে ফেসবুকে পরামর্শ চান—কীভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন মেনে চলেন এমন মানুষদের চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে :

০১. অনেকে দীর্ঘদিনে চূড়ান্ত অশ্লীলতায় এমন আসক্ত হয়েছেন যে, এ থেকে যেন তার মুক্তি নেই।

০২. মাঝে মাঝে পর্নোগ্রাফিতে ডুবে যান; সব সময় না।

০৩. অনেকে আসক্ত নন। স্বাভাবিক ইন্টারনেট ব্যবহারের মাঝে কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন বা লিংকের মতো ইন্ধন পেলে দুর্বল হয়ে পড়েন—ডুবে যান।

০৪. বাস্তবেই যথেষ্ট পরহেজগার ও বুযুর্গ। যাদের সাধারণত কখনোই পদস্খলন ঘটে না। কিন্তু বিজ্ঞাপন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসা অশ্লীলতা ও সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ব্যাপার তাদের বিব্রত করে।

আমাদের আলোচনা মূলত ওপরে আলোচিত নেক-দিল মানুষদের নিয়ে, যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে বিভিন্ন দ্বীনী পরিচয়ের সাথে যুক্ত আছেন। মানুষ যাদের দ্বীনদার বলে জানে। তাদের পক্ষেও পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকা। আর সত্যি বলতে ওয়াকিবহাল সবাই এটা জানেন যে, এটাই স্বাভাবিক। যিনি এখানে নিয়মিত থাকবেন, তাকে এসব মেনেই থাকতে হবে। এখানে অ্যালার্মিং ব্যাপার হলো, এই বিপদ এমন ভয়ংকর যে, আম-খাস সবার গায়েই কমবেশ অশ্লীলতার ধোঁয়া লাগায়; কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না!

সামনের অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করব, যা প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে ঘটছে। ঘটনাগুলো আমাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

০২.

এ তো আমাদেরই আয়না

০১. দুই ঘণ্টা—দুইটা ঘণ্টা! আহা, দুই-দুইটা ঘণ্টা ধরে ইয়াকুব এই কারাগারে বন্দী। সামান্য সময়ের জন্য ঢুকেছিল। এই তো, একটু নোটিফিকেশনটা চেক করেই বের হয়ে যাবে। ও আসলে খুব বেশি সময় ফেবুতে কাটায় না। ইউটিউবেও না। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সামান্য সময়ের নোটিফিকেশন চেক করতে গিয়েই ফাঁদে পড়ে গেল। একটা বিতর্ক চলছিল। জটিল তাত্ত্বিক। বেশ আকর্ষণীয়। পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক চলছে বেশ ক'দিন ধরে। এতে মনোযোগ দিয়েই প্যাঁচে পড়ে গেল। একে একে কমেন্ট চালাচালি চলছে। একসময় হুঁশ হলো। কিন্তু ততক্ষণে দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। খুব দুঃখ হলো ওর। খুব ভালো একটা বই পড়ছিল। সেটা না করে অযথা স্যোশাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট হলো। তাও এত লম্বা সময়, অথচ টেরই পায়নি। যাক, বের হয়ে যাই, ভাবতেই আরেকটা নোটিফিকেশন এল। পছন্দের এক ভাই কমেন্ট করেছেন। ভাবল দেখি কী লিখেছে।

পড়তে গিয়ে ইয়াকুব আবার ডুবে গেল। বুঝতেও পারল না আবার একই ফাঁদে পড়েছে। আধ ঘণ্টা পর আবার হুঁশ হলো। বড্ড অনুতাপ হলো ওর। এটা সেই অনুতাপ, যা বছরের পর বছর ধরে ওকে পুড়িয়ে যাচ্ছে। আর জানাকথা সামনেও অগণিতবার এই ফাঁদে পড়তে হবে। পড়তেই হবে—এ থেকে মুক্তি নেই।

০২. শুভর মনটা খারাপ। আজ অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা বড় গুনাহ হয়ে গেছে। ইউটিউবে কিছু ফানি ভিডিও দেখছিল। এর মধ্যেই হঠাৎ একটা মুভি ক্লিপ এসে হাজির হলো। বিষয়টা মজার। মুভির ফানি ক্লিপ। ঢুকে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে কিছু অশ্লীল অংশ চলে এল। ইচ্ছা ছিল চোখ ফিরিয়ে নেবে। বের হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্বার আকর্ষিক শক্তি তাকে চোখ ফেরাতে দিল না। অনিবার্যভাবে ডুবে গেল ও। ভিডিওটা শেষ হতেই একই ক্যাটাগরির আরও ভিডিও আসতে লাগল। প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একের পর এক ভিডিও দেখেই চলল। বেশ কিছুক্ষণ। ঘরে মা ঢুকতেই টনক নড়ল। দ্রুত মিনিমাইজ করে দিল ট্যাব। মা চলে যেতেই প্রচণ্ড দুঃখবোধ ওকে আঁকড়ে ধরল। বড্ড কষ্ট পেল ও। নাহ, আমি তো এমন চাইনি। কিন্তু কেন এমন হয় বারেবার? কেন এমনভাবে আমি ডুবে যাব? কতবার ডুবব! আমার তাকওয়া, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা কেন কাজ করছে না?

০৩. উসমান ফেসবুকে ঢুকল কিছু ভালো লেখা পড়বে বলে। মাঝে মাঝে দিল শক্ত হয়ে যায়। আখিরাতকে অনেক দূরে মনে হয়। মৃত্যুকে দূরের ঘটনার মতো লাগে। অনলাইনে কিছু ভাই আছেন, যাদের লেখায় দিল গলে যায়। হৃদয়ে দোলা লাগে। আমল বাড়াতে মনে চায়। পাওয়া যায় অন্তরের শক্তি।

কিছু ভালো লেখা খুঁজে খুঁজে পড়তে লাগল। মনটা আবার ভালো হয়ে গেল। একটা লেখা পড়ে চোখে পানি চলে এল। হৃদয়ের কষ্ট অনেকটাই দূর হলো। আনমনে স্ক্রল করছিল। এক ভাই তার বাচ্চার ছবি পোস্ট করেছেন। বেশ কিউট বাচ্চাটা—মাশাআল্লাহ! আরেকজন তার বিবাহিত জীবনের একটা মজার ঘটনা পোস্ট করেছেন। পোস্টের শেষে অবিবাহিতদের প্রতি খোঁচা দিয়েছেন বেশ। এই খোঁচাগুলোও উপভোগ্য। দ্বীনদার মানুষের হাসি-মজার মধ্যেও শরীয়ত রক্ষিত হয়। এরপর এক ভাই ইসলাম-বিদ্বেষী সেক্যুলারদের নিয়ে একটা হাস্যকর ট্রল করেছেন। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। সময় বয়ে যাচ্ছে। আরেকটা ট্রল পোস্টার দেখেও বড্ড হাসি পেল। মনের অবস্থাটা অনেকটা স্বাভাবিক এখন।

এরপর এল একটা স্পন্সরড পোস্ট। বেপর্দা এক নারীকে দিয়ে তৈরি একটা ভিডিও বিজ্ঞাপন। চোখটা নিচু করে ফেলল উসমান। কিন্তু অন্তরে এর একটা রেশ রয়ে গেল। এ সময় মনে পড়ল, ও আসলে এমনই এক পরিস্থিতি

পার করে মন ভালো করার জন্য এসেছিল ফেসবুকে। কিন্তু মনের অবস্থা কি বদলেছে? কই না তো! অবস্থা বদলেছিল, কিন্তু তা আবার আগের মতোই হয়ে গেছে।

০৪. মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব একটি মসজিদের ইমাম। সমকালীন বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে ধারণা নিতে তিনি মাঝেমধ্যে ইন্টারনেটে উঁকি দেন। সুনির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট থেকে নিউজ পড়েন। ব্যস।

আজ বিভিন্ন নিউজ পড়তে পড়তে কোনো এক আর্টিকেলে একটা বইয়ের আলোচনা এল। পড়ে মনে হলো বেশ দরকারি হবে। বইটা সম্পর্কে আরও জানতে সার্চ ইঞ্জিনে নামটা বসাতেই অনেক লিংক হাজির হলো। একটা লিংকে বইটার পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করার অপশন দেখা যাচ্ছে। ঢুকতেই কী হলো কে জানে! ওয়েবসাইটটা থেকে একা একাই নতুন লিংক তৈরি হয়ে কোথায় যেন রওনা হলো। এক সাইট থেকে আরেক সাইটে যেতে লাগল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। মাওলানা সাহেব ভাবলেন কোনো বিজ্ঞাপন লিংক হবে হয়তো। আগেও দু-একবার এমন হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক জায়গায় এসে স্থির হলো বিজ্ঞাপন পেইজ। কিন্তু একি! তিনি ব্যাপারটা হঠাৎ-চোখে বুঝে উঠতে পারেননি। ভাষাগত কারণে পুরো ব্যাপারটা যদিও তার বোধগম্য হয়নি, বাস্তবে এটা ছিল একটা অনলাইন মেসেজিং সাইট, যেখানে মানুষ ভিডিও কলে ভিনদেশি মেয়েদের সাথে চূড়ান্ত অশ্লীলতা করতে পারে। এতকিছু না বুঝলেও স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নগ্ন নারীর নোংরা আহ্বান তার চোখে পড়েছে।

এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে এত দুঃখ তিনি আর কখনো পাননি। মনে হলো যেন তার ওপর বজ্রপাত হয়েছে। এমন কেন হলো! তিনি তো প্রস্তুত ছিলেন না এমন কিছুর জন্য; মনের গহিনেও এ ধরনের কোনো কামনা তার ছিল না। ব্রাউজ করতে গিয়ে কোনো ভুলও তিনি করেননি যে, এমনটা হবে। কিন্তু কেন? কেন?

এই কষ্টের কথা কাকে জানাবেন ভেবে পেলেন না। খুঁজে পেলেন না এমন কোনো কর্তৃপক্ষ, যার কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করা যায়।

০৫. হারুন সাহেব তাবলীগের একজন মজবুত সাথি। প্রতিদিন তিনি দীর্ঘ সময় স্থানীয় তরুণদের নিয়ে দাওয়াতী কাজ করেন। তার এস্তেকামাত ও আন্তরিকতায় এলাকার ছেলে-বুড়ো অনেকের মধ্যেই দ্বীনী চেতনা তৈরি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে এই এলাকার বহু পরিবারের দ্বীনচর্চায় তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

বছরখানেক ধরে কী একটা ব্যাপার তার মনে খচখচ করছিল, কিন্তু পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একটা ঘটনায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। গত বছর থেকে একটা ছেলে মসজিদের আমলে শরীক হতো। একাধিকবার তিন দিনের জামাতেও গিয়েছে তাদের সাথে। খুব দ্রুত আমলী পরিবর্তনও আসে তার। বেশ জজবা নিয়ে দ্বীনের ওপর চলছিল। কিন্তু মাস ছয়েক ধরে একটু একটু করে সে লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। এখন তাকে মসজিদে কম দেখা যায়। জাহেলী সময়ের বন্ধুদের সাথেও মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে। এই লক্ষণ ভালো না। এটা তো খাবি খাওয়ার লক্ষণ। মাছ মরে যাওয়ার আগে নাকি এভাবে খাবি খায়।

এসব বিষয়ে ভালো খোঁজখবর রাখে এমন লোকদের সাথে আলাপ করে যা বোঝা গেল, এই ছেলেটা এবং এমন আরও যারা আছে, তারা মসজিদে অনুপস্থিত থাকলেও অনলাইনে পুরোদমে উপস্থিত। হালকা দ্বীনদার থেকে ভারী দ্বীনদাররা অনলাইনে প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। পাগড়িওয়ালা ছেলেরা পিকনিকে গিয়ে টুপি খুলে ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করছে। ইউটিউবে নাটক আর ফানি ভিডিও দেখে সময় কাটাচ্ছে। অচেনা-অজানা মেয়েদের সাথে অবাধে চ্যাট করছে।

ডুবে যাচ্ছে সব। সব ডুবে যাচ্ছে। তিনি কল্পনাও করেননি, তার আশেপাশে এতকিছু ঘটে চলেছে।

০৬. আবদুর রাজ্জাক সাহেব একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের সিনিয়র সদস্য। এলাকার জুনিয়র সদস্যদের শিক্ষা ও তারবিয়াহ বিষয়ক জিম্মাদার তিনি। প্রতি সপ্তাহে তার সঙ্গীরা তার কাছে রিপোর্ট জমা দেয় । তিনি দেখে মন্তব্য করেন; দিক-নির্দেশনা দেন।

গেল সপ্তাহে তিনি একটি পরিসংখ্যানের মতো দাঁড় করালেন। গত দুই বছরে সাথিদের আমলী উন্নতি ও সিলেবাসের পড়া আদায়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করলেন। বের হওয়া তথ্য দেখে শঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। কারণ, তিনি দেখলেন পড়া আদায়ের পরিমাণ যেভাবে বিগত দিনে কমেছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্যোশাল মিডিয়াতে দাওয়াতী কাজের পরিমাণ। কিন্তু তিনি জানেন, স্যোশাল মিডিয়াতে দাওয়াত কতটা হয়, আর কদ্দূর হয় বেহুদা সময় কাটানো। যদিও স্যোশাল মিডিয়াতে কাজ করা তাদের নিয়মিত দায়িত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই 'দায়িত্ব' অন্য সব কাজের সময়কে খেয়ে ফেলছে!

আরেকটা আশঙ্কার ব্যাপার হলো, অনলাইনে যারা বেশি সময় দেয়, তাদের মাঝে যুক্তি-তর্ক ও তথ্যের আধিক্য থাকলেও আমলী জিন্দেগী তেমন উন্নত না। যাদের আমল একসময় উন্নত ছিল, তাদের অবস্থাও নিম্নমুখী।

০৭. এত বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা একজন আলেমকে ইসলাহী মুরুব্বী হিসেবে পাওয়ায় সাব্বির আহমাদের দিল থেকে আবারও শুকরিয়া এল— আলহামদুলিল্লাহ! আজ দীর্ঘদিন পর আবারও শায়খের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাচ্ছেন। শায়খও তাকে বড় মহব্বত করেন। কখনো কখনো শায়খের সাথে কিছু ইলমী আলোচনাও হয়ে থাকে।

আজ আসরের পর কথাপ্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত হাদীস-বিশারদের আলোচনা এল। শায়খকে সাব্বির জানালেন, তিনি অনলাইনে এই মুহাদ্দিস সাহেবের কিছু ইলমী আলোচনার ভিডিও দেখেছেন। শায়খ আগ্রহ দেখানোয় সাব্বির একটা ভিডিও তাকে দেখাল। সংক্ষিপ্ত ভিডিও। দেখে মনে হলো শায়খ বেশ উপভোগ করছেন।

ভিডিওর শেষের দিকে একটা বিজ্ঞাপন এসে হাজির হলো। এল তো এল, বাজে একটা অ্যাডই এল। নূরানী পরিবেশ মুহূর্তেই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। আচমকা পরিস্থিতিতে সাব্বির লজ্জায় যেন মাটির সাথে মিশে গেলেন—হায়, এ কী হলো!

০৮. মুফতী সাহেবকে তাঁর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী দেশের বাইরে থেকে একটা স্মার্টফোন হাদিয়া পাঠিয়েছে। যদিও তিনি পুরোনো ধাঁচের বাটনওয়ালা ফোনেই (ফিচার ফোন) স্বস্তিবোধ করেন, কিন্তু এক ছাত্রের পরামর্শে এটা চালানো শুরু করলেন। ইলমী কিতাবের ভান্ডার নাকি এই ইন্টারনেট। দেশ-বিদেশের বড় বড় ইলমী ব্যক্তিত্বকে ফলো করা যায় ফেসবুক-টুইটারে।

ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিল তার এক শাগরেদ। তাতে কয়েকজন আলেমের সাথে যুক্তও করে দিল। কিতাব ডাউনলোড ও ইলমী কিছু ওয়েবসাইটের ঠিকানা চিনিয়ে দিল। মুফতী সাহেব হঠাৎ করে এক নতুন জগতে এসে পড়লেন। এত এত ইলমী উপকরণ একসাথে পেয়ে দারুণ খুশি হলেন। এর সাথে ফেসবুকে আছে জগদ্বিখ্যাত ইলমী ব্যক্তিদের লেখাজোঁকা নিয়মিত পড়ার সুযোগ।

সবই ভালো চলছিল। তবে কিছু বিষয়ের কারণে মনটা খচখচ করছিল। মুফতী সাহেব এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন, যেখানে বাচ্চারা শিশুকাল থেকেই পর্দার অনুশীলন দেখে অভ্যস্ত। কখনো তারা বেগানা নারীদের সামনে যাননি; পরিবারের নিয়ম-কানুনের কারণে এর প্রয়োজন হয়নি। পর্দাশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠায় বাইরের বেপর্দা পরিবেশে সব সময়ই খুব অস্বস্তিবোধ করেন তিনি। কিন্তু স্মার্টফোন চালানো শুরু করার পর থেকে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। এখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিভিন্ন নারীর ছবি চলে আসে। কখনো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, কখনো ফেসবুকের টাইমলাইনে। সবটা তিনি বুঝে উঠতেও পারেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনন্দিন আমলগুলো শেষ করার পর তার এক শাগরেদের সাথে বসে ছিলেন। কথা বলতে বলতে ফেসবুকে লগ-ইন করলেন।

সে পাশেই বসে ছিল। তাকে ফেসবুকে তিনি কিছু একটা দেখাতে চাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় ফ্রেন্ডশিপ সাজেশনে এক চরম বেপর্দা নারীর ছবি ভেসে উঠল। মুফতী সাহেব অত্যন্ত বিব্রত হলেন। ছাত্রের সামনে নিজেকে বড্ড অপমানিত মনে হলো। এমন পরিস্থিতিতে জীবনে আর কখনো পড়েননি তিনি।

রাগে-দুঃখে-অপমানে সাথে সাথে এক ছাত্রকে ডেকে ফেসবুক আইডি ডিলিট করে দিলেন। স্মার্টফোনকে বিদায় দিয়ে আবার বাটনফোনে ফিরে গেলেন। দরকার নেই তার এত সুবিধার!

০৯. রবিউল ইসলাম একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। অফিসে কাজের ব্যস্ততা অনেক। ছুটিও সপ্তাহে কেবল এক দিন। সারাদিন কাজ করে রাতে ঘরে ফিরে আর বাচ্চাদের সাথে তেমন সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না।

এই শুক্রবারে মাদরাসা-পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে কিছুটা সময় কাটাচ্ছিলেন। গল্প-গুজবের পাশাপাশি স্মার্টফোনে দুজন মিলে একটা কার্টুন দেখছিলেন। যদিও তিনি বাচ্চাদের হাতে ফোন দেওয়ার পক্ষপাতি নন, তবুও মাঝেমধ্যে দুর্বল হয়ে দু-একটা কার্টুন দেখতে দেন।

একে একে কয়েকটা কার্টুন দেখলেন। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন লিংক সামনে এল। ছেলেটা না বুঝেই সেটায় ঢুকে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে লিংকটা ছিল একটা স্পন্সর্ড অ্যাডভার্টাইজের। পশ্চিমা একটা নারীবাদী সংগঠনের নোংরা প্রোপাগান্ডা-বিজ্ঞাপন, যে আন্দোলন দাবি করছে, পুরুষের মতো নারীদেরও ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত করে প্রকাশ্যে চলাফেরা করার সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে সংশ্লিষ্ট একটা ভিডিও-চিত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে শুরু করল, আর স্বাভাবিকভাবেই তা ছিল দেখার অযোগ্য।

যদিও রবিউল ফোনটা কেড়ে নিয়ে ওটা কেটে ফেললেন, কিন্তু সন্তানের সামনে বেইজ্জত হওয়াটা তো ঠেকানো গেল না। চরম বিব্রত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ভাবলেন; তবে ভেবে ভেবে কূল করতে পারলেন না, ভুলটা আসলে কার ছিল।

১০. মাহবুবার ঘটনাটা খুবই আশ্চর্যজনক। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট নেককার এই নারী ইন্টারনেট চালনায় অত্যন্ত সংযমী। বিনা দরকারে এক মিনিটও এখানে থাকেন না। কারণ, এর বাস্তবতা সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা আছে তার।

কথায় কথায় ননদের সাথে তর্ক লেগে গেল একটা শব্দের বানান নিয়ে। শব্দটার শেষে কি দন্ত্য-ন নাকি মূর্ধন্য-ণ তা নিয়েই যুদ্ধ। হাতের কাছে অভিধান নেই বলে চট করে গুগলে সার্চ দিল। এক-দুইটা লিংক দেখে নিশ্চিত হতে পারল না। এরপর তৃতীয় লিংকে ঢুকল। এটা ছিল একটা বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ক আর্কাইভ। এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সাজানো।

কিন্তু একটু নিচে যেতেই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। থরে থরে সাজানো নোংরা ছবি। অথচ এ ধরনের আর্কাইভে এসব ছবি থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আছে যে, তা তো দেখাই যাচ্ছে। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। মাহবুবা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। ভাবছে—এত সাবধানতা অবলম্বনের পরেও কেন এসব নোংরামি দেখতে হয়!

১১. মানুষ যখন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে, তখন স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি কাজ করে না। এ থেকে মুক্তির জন্য একটা বড় ধরনের ধাক্কা দরকার হয়। আল-আমীনের দাদির মৃত্যুটা তার জন্য হয়তো এমনই হৃদয়-নাড়ানো এক ধাক্কা।

আল-আমীন যথেষ্ট পরহেজগার ছেলে। গায়রে মাহরাম থেকে অনেক দূরত্ব রেখে চলে। কাজিনদের সাথে পর্দা করে। দরকার না হলে একটা কথাও বলে না। আর সে-ই কিনা ছয়টা মাস ধরে একটা মেয়ের সাথে প্রেমে মজে আছে—ভাবা যায়!

অনলাইনে দ্বীনী দাওয়াতের নামে যুক্ত হওয়া 'দ্বীনী বোনেরা' যে কত বড় ফেতনা তা আজ ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওর মতো একটা ছেলে কোনো মেয়ের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাট করবে, কথা বলবে, তা কল্পনাও করা যায় না।

শুরুটা একটা দ্বীনী বইয়ের গ্রুপে আলাপ-সালাপের মাধ্যমে। প্রথমে কমেন্ট চালাচালি, ইনবক্সে দ্বীনী আলাপ-আলোচনা চলল। এরপর কথায় কথায় ব্যক্তিগত খোঁজখবর নেয়া-দেয়া। আস্তে আস্তে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা...।

হয়তো আরও ছয় মাসেও ওর হুঁশ হতো না। আজ দাদির ইন্তেকালের পর আখিরাত সামনে ভেসে উঠল। আল্লাহর হুকুমের গুরুত্ব আবার দিলের ভেতর নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। ভাবল, এই অধঃপতন কীভাবে সম্ভব হলো! আসলে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা বুঝি একেই বলে।

এই দীর্ঘ সম্পর্ক, মহব্বতের আদান-প্রদান, কত কথার স্মৃতি... সব ছুড়ে ফেলাটা কি এতই সহজ? কিন্তু এই সম্পর্কের ফাঁদে আবার পা দেয়া মানে আবার এতে জড়িয়ে যাওয়া। না, তা হতে দেয়া যাবে না।

১২. শফিকুর রহমান একজন মজবুত দাঈ। অনলাইনে ব্যাপক-বিস্তৃত তার দাওয়াতী কাজ। উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে যতভাবে সম্ভব, দাওয়াতী মেহনত করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ফোরামে দ্বীনের দিকে আগ্রহী মানুষকে দ্বীন-চর্চায় সাহায্য করতে তার সাথে একঝাঁক তরুণ কাজ করে।

ইদানীং কিছু সমস্যা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর মধ্যে গোটা চারেক নমুনা এমন :

- সন্তান সমস্যার সমাধান জানতে চেয়েছে। বাবা মোটামুটি নামাজী মানুষ। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এই বয়স্ক বাবা পর্নো-আসক্ত। মা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, সম্ভব হয়নি। পারিবারিকভাবে একাধিকবার লাঞ্ছিত হয়েও পরিবর্তন আসেনি। সুযোগ পেলেই ...।
- স্ত্রী সমাধান জানতে চেয়েছে : দ্বীনদার স্বামী অন্য মেয়েদের সাথে ফেসবুকে সম্পর্ক রাখে। শুধু তা-ই না, স্ত্রীর অগোচরে পর্নোগ্রাফিতেও ডুবে যায়। স্ত্রী খোলামেলা আলাপ করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সাময়িকভাবে স্বামী অনুতপ্তও হয়েছেন। কিন্তু এই সমাধান টেকেনি। কিছুদিন পরেও আবার একই সমস্যা নজরে এসেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ তাকওয়া দেখা গেলেও এ ক্ষেত্রে আগ্রহে বাঁধ মানানো যাচ্ছে না।

- একজন বোন তার ভাইকে নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তার ছোট ভাইটা মাদরাসায় পড়ে। বাবাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে স্মার্টফোন আদায় করেছে। প্রথম প্রথম সারাদিন ভিডিও গেমসের প্রতি আসক্ত ছিল। এখন গেইম খেলে না তেমন; তবে মোবাইল নিয়েই পড়ে থাকে। কিন্তু মোবাইলে সে আসলে কী করে তা আড়াল করে রাখে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ফেসবুকে মেয়েদের সাথে প্রেমে জড়িয়ে যাচ্ছে, নাহয় পর্নোগ্রাফিতে জড়াচ্ছে। ফোন একাধিকবার কেড়ে নেয়া হয়েছে। কাজ হয়নি। বিভিন্নভাবে তা আবার হাতিয়ে নিয়েছে। পড়াশোনার আগ্রহেও ভাটা পড়ছে। প্রায়ই ছুটি শেষ হলে মাদরাসায় যেতে গড়িমসি করে। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

- এই কেসের সমাধান যে চেয়েছে, সে নিজেই সমস্যাগ্রস্ত। পরিবারকে সে নিজেই দ্বীনের পথে টেনে এনেছে। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সে-ই দ্বীনদারীর মডেল। এদের অনেকেই তাকে ফলো করে।

  দাওয়াতের নিয়তে ফেসবুক চালানো শুরু করেছিল। কিন্তু অবিবাহিত তাগড়া জোয়ান। পর্নোগ্রাফির এই সহজলভ্যতার স্রোতের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। বহুবার তাওবা করেও বারেবার ফিরে এসেছে এই নোংরা পানির নালায়।

  গত সপ্তাহে ঘটনাক্রমে তার এই গোপন কর্ম পরিবারের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। এমন ছেলে এসবে লিপ্ত হতে পারে তা পরিবার স্বপ্নেও ভাবেনি। অপমান সইতে না পেরে একাধিকবার সুইসাইডের চিন্তাও করেছে। কোনোভাবেই সে সহজ হতে পারছে না পরিবারের সাথে।

শফিক ভেবে ভেবে ক্লান্ত হলো, কিন্তু সঠিক ও স্থায়ী কোনো সমাধান খুঁজে পেল না। কারণ, যেসব উপায় হাতে আছে, তা প্রয়োগ করে যেসব সমাধান মিলে, তা সবই সাময়িক। বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই তা দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে না। বারেবার চক্রে ফিরে আসা—এই যেন অলঙ্ঘনীয় নিয়তি।

***

ওপরের ঘটনাগুলো কাল্পনিক মনে করলে ভুল হবে। এর প্রায় প্রতিটিই বাস্তব। এগুলো উপস্থাপনের উদ্দেশ্য, ওইসকল পাঠকের সামনে বাস্তবতা তুলে ধরা, যারা চলমান সংকট সম্পর্কে বিশেষ অবগত নন।

০৩.

এ ক্ষতিগুলো শুধু ক্ষতি নয়

ইন্টারনেটযুক্ত স্মার্টফোনের অবাধ ব্যবহার একজন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ে আমরা স্মার্টফোনের অবাধ ব্যবহারের কিছু মোটাদাগের ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করব, যা সহজেই বোধগম্য। এর বাইরেও আরও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি রয়েছে, কিন্তু বিষয়গুলো এতটাই স্পষ্ট যে, এত বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

০১. বাচ্চাদের মেধা নষ্ট

যেসব বাচ্চা দৈনিক কয়েক ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ সাধারণ বাচ্চাদের চেয়ে কম হয়। এই বাচ্চারা পড়াশোনায় গাফেল হয়। ক্লাসের পড়া শিখতে পারে না। ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগ্রহী হয় না। শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি মানসিকভাবে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। সামাজিক আচরণ-বিধিও মেনে চলে না। পারিবারিক সৌহার্দ্যও কম থাকে। দায়িত্ব-সচেতনতাও থাকে না বললেই চলে। সারাদিনের মূল মনোযোগ থাকে স্মার্টফোনের স্ক্রিনের দিকে।

বাচ্চারা সাধারণত স্মার্টফোন হাতে পেলে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় গেইমের মাধ্যমে। এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ ছাড়া বন্ধুদের সাথে চ্যাট করা, স্যোশাল মিডিয়াতে মেতে থাকা, রাত জেগে মুভি বা খেলা দেখায় খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্মার্টফোনে অভ্যস্তদের ঘুমে প্রচুর ব্যাঘাত ঘটায় এরা মানসিকভাবে থাকে অস্থির। এর পরিণতিতে জড়িয়ে পড়ে চরম ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন কাজে। জড়ায় বিভিন্ন ধরনের আসক্তিতেও। শুরুতে নিয়ন্ত্রণ করা না

হলে পরে তা আর নাগালের ভেতর থাকে না। এমনকি বেশির ভাগ দ্বীনদার অভিভাবকও এটা মেনে নেন। অথচ বাচ্চাদের হাতে স্মার্টফোন কতটা ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনতে পারে তা কল্পনারও বাইরে।

অল্প বয়সের বাচ্চারা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের ভুলভাল বোঝানো তুলনামূলক সহজ। এরা বিভিন্ন ক্রিমিনালের সহজ টার্গেট। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে নিজের ও পরিবারের নানারকম ক্ষতি করে ফেলতে পারে। সাইবার-ক্রাইমের ধরনের কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। নিত্যনতুন চেহারা নিয়ে এর উদয় হয়, যা শিশু-কিশোররা বুঝে উঠতে পারে না।

বাচ্চারা একটু কৌতূহলী হয়ে থাকে। নতুন জিনিস দেখলে তার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। এর পাশাপাশি যদি তা হয় এমন কোনো ব্যাপার, যা সবাই গোপন করার চেষ্টা করে, তার প্রতি আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যৌনতা বিষয়ে কিশোর বয়সে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। এমন মনোযোগ সৃষ্টিকারী ও আশ্চর্য নতুন জগৎ সম্পর্কে যখন কিছু কিছু জানতে পারে, বড় আশ্চর্য হয়। পুরো ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে এক অনুপম মনো-দৈহিক শিহরণ তৈরি করে। এ বয়সে যদি কোনোভাবে এই কিশোর অবাধ ও সহজলভ্য অশ্লীলতার উৎস হাতের কাছেই খুঁজে পায়, তখন কে আছে তাকে এ থেকে বিরত রাখবে! আর যে বাচ্চা এমন বয়সে এসবে মেতে উঠবে, সে যে দৈহিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা খুব পরিষ্কার ব্যাপার।

বর্তমান বাস্তবতাই এমন যে, ১০-১১ বছরের কিশোরেরা অহরহ এতে মশগুল। এমনকি অনেকে এই বয়সের আগেই এতে ডুবে যায়। আর এই বাচ্চাদের হাতে বাবা-মা অবলীলায় ইন্টারনেটযুক্ত স্মার্টফোন দিয়ে দেন। কখনো খবর নেয়ার চেষ্টাটুকু করেন না, এরা এটা দিয়ে কী করে। এমনকি রাতের বেলায় এই ছোট মানুষগুলোর হাতে ফোন থাকে। বাবা-মা জানেনও না তার সন্তান কীভাবে রাত পার করল! কত সরল! কিন্তু বাস্তবতা কি এতটাই সরল?

হায়, এ অভিভাবকদের কে বোঝাবে, যেখানে ৯০% কিশোর পর্নোগ্রাফিতে মশগুল, সেখানে আমার বাচ্চা ভালো থাকার কোনো গ্যারান্টি

নেই। এমন সময়ে কোন সাহসে এই কালসাপের চেয়েও বিষধর ডিভাইস আমি আমার সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছি? এই ভালো ধারণার ফল কত করুণ হতে পারে তার উদাহরণ তো প্রতিদিনই আসছে। তবুও কি আমাদের ঘুম ভাঙবে না?

০২. মনোযোগে বিক্ষিপ্ততা

অনলাইন, বিশেষত ফেসবুক বিপুল তথ্যের এক ভান্ডার। বিভিন্ন বিষয়ের এত এত কন্টেন্ট থরে থরে সাজানো যে, এর ভেতর ডুব দিলে তা অন্তরের একাগ্রতা কেড়ে নেয়, মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। অনলাইনে সময় দেয়া শুরু করার পর থেকে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারে না। অফিসের কাজে মানুষের মন বসে না। যেকোনো আলোচনা বা পরামর্শের মজলিসে ফোনে একটি নোটিফিকেশন আসলে পুরো মনোযোগ এলোমেলো হয়ে যায়।

একটা তথ্য খোঁজার জন্য সার্চ দিলে অসংখ্য তথ্য এসে হাজির হয়, শেষে এত তথ্যের ভিড়ে আসল কাজই এলোমেলো হয়ে যায়। তথ্যের আধিক্য এখন প্রকারান্তরে কাজের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর আরেকটা দিক হলো, অন্তরে নসিহতের প্রভাব না পড়া। এখন প্রচুর দ্বীনী বয়ান, লেখাজোখা, ভিডিও-অডিও, আর্টিকেল-বই থাকার পরেও মানুষের মনে এর প্রভাব পড়ে না। পড়লেও তা স্থায়ী হয় না। অস্থির অন্তর দ্রুত অন্য কোনো দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। নসিহত বাস্তব জীবনে রেখাপাত করে না।

মোটকথা দাওয়াত বড্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। যত বেশি কাজ করা হয়, সে তুলনায় প্রাপ্তি বড় অল্প।

০৩. কর্মঘণ্টা নষ্ট

দিনে-রাতে বিভিন্ন সময় মানুষ প্রচুর সময় নষ্ট করছে, যার প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন কাজকর্মে। সময়ের কাজ সময়ে করা হচ্ছে না। অফিসের বসের অভিযোগ কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ ঠিকভাবে করে না, দায়িত্ব পালন

করে না, অফিসে দেরি করে আসে; শিক্ষকের অভিযোগ, ছাত্রের বাড়ির কাজ আদায় হয় না, পড়া মুখস্থ করে না। স্ত্রীর অভিযোগ স্বামী দায়িত্ব পালন করে না, স্বামী দেখে স্ত্রী ঘরের কাজ না করে ফোনে বুঁদ। বাচ্চারা বাবা-মায়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সময় পায় না। বাবা-মা সন্তানকে কথা শোনাতে পারে না।

এই সকল সমস্যার মূল কারণ হলো, প্রত্যেকের প্রতিদিনকার একটা বড় সময় কেটে যাচ্ছে ফোন আর ইন্টারনেটে। ফেসবুকে স্ক্রল করে, গেইমের জগতে হারিয়ে গিয়ে, ভিডিওর পর ভিডিও দেখে কখন যে জরুরি সময়টা পার হয়ে যাচ্ছে তা বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই ভাবা হয়, আগামীকাল থেকে সাবধান হয়ে যাব। কিন্তু এই কারাগার থেকে যে মুক্তি নেই। অবচেতনে প্রতিটি নতুন দিন গতদিনের পথেই পা বাড়ায়। একসময় মেনে নিতে হয়—এ-ই আমার নিয়তি, এ থেকে মুক্তি নেই।

০৪. অর্থের অপচয়

দীর্ঘদিন বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি আমাদের ফ্রি কথা বলালো। আমরা খুশি হলাম। কিন্তু এটা বাস্তব একটা ব্যাপার যে, এই সময়টাতে আমরা ফ্রি কথা বলে বলে আসলে বেহুদা কথা বলতে অভ্যস্ত হলাম। পাঁচ টাকা প্রতি মিনিটের সময়ে এক মিনিটে যে কথা সারা যেত, তা সারতে আমরা ব্যয় করা শুরু করলাম পাঁচ মিনিট। অভ্যস্ত হওয়ার পর ফ্রি সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের বেহুদা কথার অভ্যাস দূর হলো না। দৈনিক দীর্ঘ সময় মোবাইলে ব্যয় হওয়া একটা নিয়ম হয়ে গেল। ফোনে প্রচুর টাকা খরচ হওয়াটা আমরা স্বাভাবিক খরচের খাতে ধরে নিলাম।

এরপর এল ইন্টারনেটের খরচ। প্রথমে অল্প খরচ করা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন অফার, বোনাস এমবি, ফ্রি ফেসবুক, ইমো/ইউটিউব বান্ডলের মাধ্যমে আমরা অভ্যস্ত হলাম। এই অভ্যাস একসময় আমাদের প্রতিমাসে একটা বড় ইন্টারনেট বিলকে মেনে নেয়াটা সহজ করে দিল। এখন মনে হয় এটা একটা প্রয়োজন। কিন্তু এই 'প্রয়োজন' বাস্তবে কতটা প্রয়োজনীয়, তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়।

একসময় যে মানুষটা ফ্রি ফেসবুক চালাত, সেই মানুষই এখন অবাধে ভিডিও দেখছে। কারণ, এখন এমবি কেনা হয় না, কিনতে হয় কয়েক জিবি। এটা কি অর্থনৈতিক উন্নতির আলামত? না, এটা সুকৌশলী ব্যবসায়িক চালের মাধ্যমে বদলে যাওয়া মানসিকতা।

এর একটা বড় অংশ সুনিশ্চিত অপচয়, যা মনের ভেতর প্রয়োজনের ওয়াসওয়াসা তৈরি করছে। একজন বিবেকমান ব্যক্তি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই এর স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

এর বাইরে আছে অনলাইন মার্কেটগুলো। এগুলো তো অপচয়ের বড় কেন্দ্র। একটা প্রোডাক্ট কিনতে গিয়ে একজন ক্রেতা আরও অসংখ্য জিনিস অর্ডার করে বসেন। যেহেতু তখনই টাকা পরিশোধ করতে হয় না, তাই এতে মানুষ আরও বেশি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। এখন তো কয়েক মাসের কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগও তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতিতে মানুষ আরও বেশি অপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনবে এবং অনেকে অপচয় করার পাশাপাশি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়বে।

০৫. অনলাইন মার্কেটিং এর নামে বাজার-ভ্রমণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ এবং নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।' (মুসলিম)

অনলাইনে কেনাবেচা করা মৌলিকভাবে আপত্তিকর না। কিন্তু এখানে বড় একটা সমস্যা হলো, এক-একটা অনলাইন শপের ওয়েবসাইটে ঢুকলে বের হওয়াই মুশকিল। প্রতিটি প্রোডাক্টই মনে হবে জরুরি, সস্তা ও আকর্ষণীয়। প্রতারণার বিষয়টা বাদ দিলেও এতে বড় সমস্যা হলো, বেহুদা জিনিসও মানুষ জরুরি ভেবে কিনছে। বিপুল সম্ভারের কারণে মানুষ দরকারের বাইরের পণ্যও কিনতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এখানে থাকলে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মে। আর বেপর্দা পরিবেশ তো আছেই।

বিজ্ঞাপন ও পণ্যের বিন্যাসের কারণে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হচ্ছে। এমন বস্তুকেও নিজের জন্য জরুরি ভাবছে, যা বাস্তবে কখনোই তার লাগবে

না। এভাবে কেনাকাটা করে মানুষের অপচয়ের হাত বড় হবে। বাড়তি খরচ ধারদেনা আর অসৎ ইনকামের দিকে নিয়ে যাবে।

সময়ের অপচয় অনলাইন মার্কেটে একটা অনালোচিত বিষয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে ব্যয় হয়ে যায়। একেকটা পণ্য দেখা, মূল্য যাচাই করা, একই ধরনের আর কী আছে তা দেখা, একই মূল্যের এরচেয়ে ভালো কী পাওয়া যায় তা খোঁজা। এক ওয়েব-মার্কেটের সাথে অন্যটার দামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।... এসবে প্রতিদিন অগণিত মূল্যবান সময় খরচ হয়ে যায়। সময়—যা ছিল এই দুনিয়াবি জীবনের মূল পুঁজি, যা হারিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে পাওয়া যাবে না, যার ক্ষতি কখনো পূরণ করা যায় না।

০৬. লজ্জা হ্রাস পাওয়া

যারা নিয়মিত টিভি-সিনেমা দেখে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে লজ্জা কমতে কমতে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ভয়ংকর অশ্লীল দৃশ্যও পরিবারের সবাই একসাথে দেখতে পারে। এসব খারাপি থেকে দ্বীনদার লোকজন অন্তত নিরাপদ। কমপক্ষে এটুকু লজ্জাবোধ একজন দ্বীনদার মানুষের থেকেই থাকে। কিন্তু ইন্টারনেটের বিস্তার এখন দ্বীনদারদের মাঝেও লজ্জাহীনতা তৈরি করছে। অনিচ্ছাকৃত চোখে পড়া অশ্লীলতা চোখকে অভ্যস্ত করে তুলছে। একসময় অপরাধবোধ আর খারাপ লাগার অনুভূতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবাধে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাতায়াতের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে; এমন-সব ওয়েবসাইট, যেখানে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ রয়েছে।

অভ্যস্ততা এমন এক খারাপ ব্যাপার, যার মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা মানুষও নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে গুনাহের সাথে আপস করে ফেলে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। মেনে নেওয়া হয়। অথচ একই ব্যক্তি হয়তো একসময় কঠোরভাবে নজরের হেফাজত করত। আজ অভ্যস্ততার মারপ্যাঁচে পড়ে সেই তাকওয়াপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না।

আরেকটা দিক হলো পর্দানশীন নারীদের স্বামীরা পশ্চিমা নারী ও বেহায়া পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে নিজ স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে।

অবাধে ইন্টারনেট চালালে এসব চিত্র সামনে আসবেই। দিনে দিনে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। কখনো কখনো নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এতে মশগুলও হয়ে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। নিয়মিত এসব বেপর্দা পরিবেশে থাকার যে প্রভাব অন্তরে পড়বে, তা অকল্পনীয়। উলামায়ে কেরাম বলেন, বান্দা এসব গুনাহের কারণে অনেক আমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

শায়খ আলী তানতাভী রহ. এর কথা ভাবি, তিনি তো ৫০-৬০ বছর আগে থেকে অবিবাহিতদের চরিত্র হেফাজতের জন্য লিখেছেন। তখন স্মার্টফোন ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, রাস্তার নারীদের বেহায়াপনা এখনকার মতো ছিল না। হায়, আজকের অবস্থা তিনি যদি দেখতেন! আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরানী করুন। আমীন।

০৭. ভিডিও কলিং অ্যাপ

অসংখ্য ভিডিও কলিং অ্যাপের মধ্যে আমাদের দেশে বর্তমানে (২০২০ খ্রি.) ইমো আর হোয়াটসঅ্যাপের নামই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সামনে এমন আরও বহু কিছু বের হবে। ধরনেও আসবে পরিবর্তন। কম খরচে ও সহজে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এই অ্যাপগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়। ইন্টারনেটভিত্তিক এই অ্যাপগুলো আজ এক কল্পিত প্রয়োজন। এর অজুহাতে নারী-পুরুষ, শহর-গ্রামে নির্বিশেষে প্রচুর মানুষের হাতে স্মার্টফোন শোভা পাচ্ছে।

এটা একটা ফাঁদ। প্রথমত এই উসিলায় মানুষ ইন্টারনেট চালনায় অভ্যস্ত হচ্ছে। সহজভাবে নিচ্ছে। এমনকি এমন মানুষও এতে অভ্যস্ত হচ্ছে, যে ইন্টারনেটের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না। অনেকে বিভিন্ন রকম বিপদেও পড়ছে। অনেক দ্বীনদার পরিবারের নারীরা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতারক-চক্র তো সব জায়গাতেই সক্রিয়।

এই অ্যাপগুলো দীর্ঘদিন শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই ছিল; অন্যান্য আপদ এখানে তেমন ছিল না। কিন্তু ইদানীং এতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক ফিচার যোগ করা হচ্ছে। ভিডিও শেয়ার করা, স্ট্যাটাস শেয়ার করার অপশন

যোগ করা হয়েছে। এতে এই অ্যাপগুলো আর আগের মতো নির্দোষ থাকছে না। প্রচুর বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে, যার কারণে পর্দা-পুশিদা বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসা ভিডিও দেখে মানুষ অলস সময় কাটাচ্ছে । পাশাপাশি এতে অশ্লীল লিংকও যুক্ত হচ্ছে। যৌন উসকানিমূলক মেসেজ অনিয়ন্ত্রিতভাবে আসছে।

অ্যাপের নির্মাতারাও যেকোনো মূল্যে মানুষকে এতে বেশি থেকে বেশি সময় মশগুল রাখতে কাজ করছে। নতুন নতুন আকর্ষণীয় ফিচার যোগ করছে। যার ফলে এই অ্যাপগুলোও এখন মানুষকে আসক্ত করছে। অদৃশ্য বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছে। এখান থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফেসবুকের মতো ইমো-হোয়াটসঅ্যাপও ভিন্ন রকম কল্পিত কারাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

০৮. বেহুদা কাজ

উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ একসময় দ্বীনের স্বার্থে অনলাইনে পা রেখেছিলেন। যদিও সবার নিয়ত এক ছিল না, কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দ্বীনের দাওয়াতের প্রয়োজনেই এতে যুক্ত হয়েছিলেন। যুক্ত হয়েছিলেন চলমান বিশ্ব সম্পর্কে খোঁজখবর রাখাকে একটা জরুরত মনে করে। আর একটা পর্যায় পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট।

কিন্তু গত বছরগুলোতে আমাদের নিয়তের ওপর আমরা কতটা টিকে থাকতে পেরেছি তা ভাবার বিষয়। শুরুটা বা শুরুর বছরটা হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই তথ্যের মহাসম্ভার ও উত্তাল তরঙ্গ গ্রাস করে নিয়েছে বেশির ভাগ মানুষের নিয়ত। এখন বরং আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। আগে আমরা মোবাইল ফোন চালাতাম, এখন মোবাইল ফোন আমাদের চালাচ্ছে। অজানা মোহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি। সময়ের যেন কোনো মূল্য নেই। এ যেন অফুরন্ত জান্নাতী সময়। এটা যেন সেই সময় না, যা কখনো ফিরে আসবে না।

ফেসবুকে ও ইউটিউবে ব্যস্ত থাকা একটা সাধারণ ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এর কোনো গন্তব্য নেই। এর

কোনো শেষ নেই। এই সফরের উদ্দেশ্য হলো শুধু চলা এবং নিরন্তর চলতেই থাকা।

হ্যাঁ, এই ব্যস্ততা এখন বেশির ভাগ মানুষের জন্য আর দ্বীনী ব্যস্ততা নয়; এটি এখন সময় কাটানোর একটা নিরেট দুনিয়াবি মাধ্যম। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এর সাথে অন্যান্য বিনোদন-ব্যবস্থার পার্থক্য খুব বেশি নয়।

যারা সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে এসব অ্যাপ ব্যবহার করছেন, তাদের জন্য এটা নিতান্ত বেহুদা কাজ। নির্দোষ বেহুদা কাজ নয়; বরং এতে আছে গুনাহের প্রচুর সম্ভাবনা। একজন মুত্তাকী মানুষ নিশ্চয় এটা উপলব্ধি করবেন।

এই উপলব্ধি থেকেই অনেক মানুষ এই চক্র থেকে বের হতে সচেষ্ট হন। একজন দ্বীনদার মানুষ দেখেন, তার মূল্যবান সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে। তিনি তিলাওয়াতের সময় পাচ্ছেন না, বইপত্র পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, যিকির-আযকারের ফুরসত মিলছে না। তার অবচেতন মন তাকে সতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ এসব ত্যাগ করতে সফল হন, আবার কারও পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় বড্ড কঠিন।

০৯. বৃদ্ধদের শেষ সময়ের শঙ্কা

যদিও যুবক-বুড়ো সবার হায়াতই অনিশ্চিত, তবু বৃদ্ধদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা আতঙ্কজনক। এ ক্ষেত্রে উপযোগী হিসেবে আমার মোহতারাম বাবার উদাহরণটা আনা যায়।

বাবা মারা যাওয়ার আগে কয়েক মাস ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। লিভার ক্যান্সারের চূড়ান্ত পর্যায়ের লক্ষণগুলো ধরা পড়তে শুরু করল। আমরা ঘটিতব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এর মধ্যে গ্রামের কোনো এক আত্মীয় তাঁকে একটি স্মার্টফোন হাদিয়া পাঠাল। তিনিও তা ব্যবহার করা শুরু করলেন।

আমি এই ঘটনায় মারাত্মক রকম ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ, এ ধরনের ক্যান্সারের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে তাঁর হাতেগোনা কিছুদিন আয়ু থাকার কথা। এমন গোনা গোনা দিনগুলোর মাঝে হাতে আসা এই স্মার্টফোন যদি তাকে গুনাহে লিপ্ত করে, এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। এর একটা বড় কারণ, তাঁর এই শারীরিক অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনিদের ভিডিও কলে দেখার বাসনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কে যেন তাঁকে ইমো অ্যাকাউন্টও খুলে দিল। দ্বিধা-সংশয় পেছনে ফেলে ব্যাপারটা তার সাথে খোলাখুলি আলাপ করলাম। সমস্যাটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বললাম।

আপনার শরীর খারাপ। ইন্টারনেট চালালে কিছু-না-কিছু গুনাহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনি যেহেতু এসবে অভ্যস্ত না, সমস্যাগুলো ম্যানেজ করতে পারবেন না। এই অবস্থায় উচিত হবে না নতুন করে গুনাহের সাথে জড়িত হওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ, তিনি বুঝলেন। আর আগে বাড়লেন না। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। যদি আমি তাঁর সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ না করতাম, হয়তো তিনি সরল মনে কিছু গুনাহের ফাঁদে পড়ে যেতেন। এতে আমার মনের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে যেত।

প্রতিটি মানুষ আখিরাতের পথিক। এর মধ্যে বৃদ্ধ মানুষগুলো এই পথে অনেক দূর এগিয়ে। তাদের জীবনটা এখন স্বাভাবিক হিসেবে শেষের দিকে। অল্প কিছু হাতেগোনা দিন বাকি। এই দিনগুলো নেক আমলের পুঁজি বাড়ানোয় কাজে লাগানোই কাম্য। আর বৃদ্ধ বয়সের গুনাহ বড় দৃষ্টিকটু।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে স্মার্টফোনের খপ্পড়ে পড়ে বহু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ ছোট থেকে বড় পাপের মাঝে লিপ্ত হয়ে পড়ছেন। এই মানুষগুলো সাধারণত ভিডিও কলিং অ্যাপগুলো বেশি চালিয়ে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন ও নাতি-নাতনিদের ভিডিও কলে দেখা একটি নির্দোষ কাজ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এতে থাকা বিজ্ঞাপন, অশ্লীল কন্টেন্ট থেকে বাঁচার কোনো পথ তাদের কাছে নেই।

অনেকে সরল মনে বাবা-মাকে স্মার্টফোন কিনে ইউটিউবে ওয়াজ শোনার বন্দোবস্ত করে দেন। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ইউটিউব অনেকের জন্যই

নিরাপদ না। সবাই সংযম দেখাতে পারবেন না। শয়তান তাকে ধোঁকা দেবে, গুনাহের আকর্ষণ মনের ভেতর তৈরি করবে। নফস তাকে ভেতর থেকে চাপ দেবে। সব শেষে পরিস্থিতি আমার পছন্দনীয় নাও থাকতে পারে। এমনটা মনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে।

একজন বৃদ্ধ মানুষও যৌন উদ্দীপক ছবি ও ভিডিও দ্বারা প্রভাবিত হন। আকর্ষণ বোধ করেন। আরও দেখতে আগ্রহ বোধ করেন। যখন একজন মানুষের হাতে একটি ইন্টারনেটযুক্ত স্মার্টফোন আছে, দেখার আগ্রহ আছে, সুযোগ আছে, শয়তানের ওসওয়াসা আছে, নফসের ধোঁকা আছে, তখন কে তাকে রক্ষা করবে নিজের শেষ সময়ের আমলনামাকে গুনাহের কালিমা থেকে পবিত্র রাখতে! বাস্তবতা হলো, এমন অসংখ্য অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটছে। তাই এসব ক্ষেত্রে খুব ইতিবাচক ধারণা না করাই নিরাপদ।

ইউটিউব একটা নদীর স্রোতের মতো। এটা কাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। ইউজার যে ধরনের ক্যাটাগরি বাছাই করছে তাকে কেন্দ্র করে এই স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে যেকোনো দিকে। ইউটিউবের এমন বিরূপ আচরণের সাথে কমবেশ সবারই পরিচয় আছে। যে আধঘণ্টা আগে দ্বীনী বয়ান শুনছিল, সে যে আধঘণ্টা পর ভেসে ভেসে পশ্চিমা কোনো নারীর আকর্ষণীয় ঘটনায় মশগুল হবে না, তার নিশ্চয়তা নেই।

বিভিন্ন হাস্যকর ভিডিও, নাটক-সিনেমার নির্বাচিত অংশ, খেলাধুলার টানটান উত্তেজনার মুহূর্তগুলো, সেলেব্রেটিদের গোপন খবর, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অমুক তারিখে, অমুক ব্যক্তির আসল রূপ... ইত্যাদি শিরোনামে অসংখ্য-অগণিত কন্টেন্ট অপেক্ষায় আছে আমাদের প্রিয় মুরুব্বিদের আখিরাতের সর্বনাশ করতে।

১০. রাত্রিজাগরণ

স্মার্টফোন বিভিন্নভাবে এর ব্যবহারকারীকে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে প্ররোচিত করে। একজন স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাত জেগে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত জাগার এই অভ্যাস শুধু একটি সমস্যা

না, অসংখ্য সমস্যার শিকড়। মানুষ রাতের নির্জনতায় পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পর্নোগ্রাফিতে আসক্তদের অনেকেই বলেছেন, একাকিত্ব, নির্জনতা ও রাত্রিজাগরণ এসব কাজে আগ্রহী করে তোলে। রাত জাগার কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অন্ধকারে আলোকিত ফোনের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে চোখের ক্ষতি হয়। সকালে দীর্ঘ সময় ঘুমাতে গিয়ে অফিসে বা ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যায়। ঘুমের ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা তৈরি করে। দ্বীনদার লোকজনও ফযরের জামাত, এমনকি নামাজ মিস করে ফেলেন।

ঘুমানোর সময় ফোন পাশে থাকলে তা বারেবার হাতে নিতে মনে চায়। কোনো কারণ ছাড়াই একটু ইন্টারনেটে ঢুঁ মারতে মনে চায়। অনলাইনে পেয়ে অনেক মানুষ ইনবক্সে নক করে। মেসেজ চালাচালি শুরু হয়। সময় পার হতে থাকে। রাত গভীর হতে থাকে। গভীর রাতে সময়-জ্ঞান লোপ পায়। ঘণ্টাগুলো পার হতে ষাট মিনিট লাগে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সন্ধ্যা শুরুই হয় যেন রাত এগারোটায়। ক্রমান্বয়ে এই সময়ে অভ্যস্ত হতে থাকা একেই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করে। অথচ এশার পরে একান্ত জরুরি কোনো কাজ ছাড়া জেগে থাকতে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। যারা এশার পর দ্রুত শুয়ে পড়েন, তাদের জন্য তাহাজ্জুদ আর ফজরে ওঠা সহজ। ফজরের পরে ঘুমের চাপও থাকে না। এ নিয়ম স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

১১. মা-বোনদের বিভিন্নমুখী ফিতনায় জড়ানো

নারীদের প্রতি প্রতারকদের বাড়তি মনোযোগ থাকে। বিভিন্নভাবে তারা অনলাইনে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। অনেকে বিভিন্ন ফাঁদে পড়ে অর্থের পাশাপাশি নিজের সম্ভ্রমও হারিয়ে ফেলছেন। ইমো-ভাইবারের মতো অনলাইন ভিডিও কলিং অ্যাপে, অনলাইনে কেনাকাটার বিভিন্ন সাইটে, ফেসবুকের উন্মুক্ত ময়দানে, ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেলে ওত পেতে আছে বিভিন্ন বিপদ।

অনেকে অনলাইনে দ্বীন শিখতে গিয়ে বিভিন্ন ফিতনায় জড়িয়ে যাচ্ছেন। ইউটিউবে বয়ান শুনতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুদা সময় নষ্ট

করছেন। নিউজ, রান্নার প্রোগ্রাম, সেলাই ইত্যাদি দেখাকে প্রয়োজন বানিয়ে নিয়েছেন, যা বাস্তবে 'প্রয়োজনের' পর্যায়ে কতটা পড়ে তা ভাবার বিষয়। এসবে ব্যস্ত হয়ে অনেকে পরিবারের জরুরি কাজে অবহেলা করে ফেলেন। দায়িত্ব পালন করা হয় না। পারিবারিক অশান্তি দানা বাঁধে।

ইন্টারনেট চালিয়ে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছেন, এমনকি সংসার ভেঙেছেন, এমন ঘটনাও তো প্রচুর। কারণ, এ জগৎ কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে। আরও জানতে প্রলুব্ধ করে।

এই মানুষটা কে? দারুণ একটা কথা বলল তো!

প্রোফাইল পিকচারটা সুন্দর তো! মানুষটা কে?

আরে, বোকা লোকটা এটা কী বলল! লোকটা আসলে কে?

বিভিন্নভাবে কৌতূহল বাড়তে থাকে। বাড়তেই থাকে।

বিভিন্নভাবে পর্দানশীন নারীদের ছবি নিয়ে প্রতারণা করার কথা শোনা যায়। একজন নারী, যিনি স্মার্টফোনের ব্যবহার, ইন্টারনেটের ব্যবহার তেমন ভালো জানেন না, তাকে দিয়ে একজন প্রতারক পুরো পরিবারকে জিম্মি করে ফেলতে পারে। বিপুল পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। পরিবারের মান-ইজ্জত ধ্বংস করে দিতে পারে।

***

স্মার্টফোন, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে স্যোশাল মিডিয়া মানুষকে কর্মহীন স্বপ্নবিলাসী বানিয়ে দিয়েছে। এখানে বাকপটুতা পরিশ্রমের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। নিজের কাজের প্রতি উদাসীনতা ও অন্যের কাজের ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমালোচনার প্রবণতা এখানে প্রসার পেয়েছে। এই ব্যাধি আমাদের ভেতরে ভেতরে অচল করে দিচ্ছে। যুবকদের যেকোনো বাস্তব দুর্যোগ মোকাবিলা করার সক্ষমতা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অলস স্ক্রলিং; নিজের প্রতি সুধারণা; নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় আর চমৎকার করে উপস্থাপনের প্রবণতা কেবলই বাড়ছে।

এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ইন্টারনেটের কারণে কিছু-না-কিছু দ্বীনী ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। কারণ, এটা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। এখানে ব্যবহারকারীর হাতের বাইরে অনেক কিছু হতে পারে। সে না চাইলেও অনেক কিছু দেখতে বাধ্য হতে পারে। এমন অনেক কন্টেন্ট তার কাছে আসতে পারে, যা তাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাবে গুনাহের কাছে; অন্তত বেহুদা ব্যস্ততায় তো লিপ্ত করবেই।

ফেসবুকে এমন ভূরি ভূরি মানুষ আছেন, যারা বারেবার সিদ্ধান্ত নেন, এখান থেকে দূরে সরে যাবেন। কিন্তু এ যে এক চক্র; যেখানে বারেবার ফিরে আসে আসক্ত মানুষেরা। যেন এ থেকে মুক্তি নেই। মরণ-চক্র। ঘুরে ঘুরে ফিরে আসাই এর নিয়তি।

আমরা যদি নিজেদের ও নিজ পরিবারের সদস্যদের স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের বিপদ থেকে বাঁচাতে না পারি, যে দ্বীনী ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা লালন করি, তা অর্জিত নাও হতে পারে। বহু মানুষ তো এখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। দ্বীনী শিক্ষা দেয়ার পরেও সন্তান চরিত্রহীন হচ্ছে। মেয়েরা পরপুরুষের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। সন্তানরা পশ্চিমা মোডারেট দ্বীনী ফিকির আমদানি করছে। দ্বীনের বিকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করছে। ঘরে থেকেও চিন্তা-ফিকির ও তারবিয়াতের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তাই নিজ সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও যদি ভালোভাবে চিন্তা করি, আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

০৪.

অনলাইনে দাওয়াত ও অপ্রশান্ত অন্তর

অন্তর যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেকোনো বিষয়ে মনোযোগী না থাকে সে জন্য পূর্বের নেককার মানুষেরা সাধনা করতেন। কেউ কেউ ইলম অর্জনে একাগ্রচিত্ত থাকার জন্য বাজারের রাস্তা ব্যবহার না করে ঘুরে গ্রামের ভেতরের বিকল্প রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। কারণ, বাজারে প্রচুর জিনিসপত্রের দিকে নজর যায়। এতে চিন্তা ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। এমন নেকদিল মানুষদের উত্তরসূরি হয়ে আমরা করে থাকি এর বিপরীত কাজ। আমরা আরও অন্তর বিক্ষিপ্ত করার বিভিন্ন আয়োজন করে থাকি। খুঁজে খুঁজে বের করি, নতুন কী করা যায়!

অন্তর বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা মূলত দুটো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি :

০১. অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছি।

০২. অহেতুক কাজে লিপ্ত হচ্ছি।

একে তো পূর্বসূরিগণ মজবুত ঈমানদার ছিলেন, পাশাপাশি ছোট ছোট ব্যাপারেও সতর্ক থাকতেন, যেন বেহুদা কোনো ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি না হয়। অপরদিকে আমরা এমনিতেই দুর্বল ঈমানদার। আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় আমাদের খুবই কম। এর পাশাপাশি আমরা এমন এমন বিষয়ে নিজেদের ব্যস্ত করে রাখছি, যার মাধ্যমে চোখ ও অন্তরে ফাহেশা (অশালীন) জিনিস স্থান পায়, যৌন উদ্দীপনা সতেজ হয়। গুনাহের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

অনলাইনের এ জগৎ শুধু উত্তেজনা তৈরিই করে না; তা প্রশমনের জন্য পর্যাপ্ত গুনাহের বন্দোবস্তও এখানে আছে।

এখানে এসো, গুনাহের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করো।

এরপর তা মেটানোর ব্যবস্থাও এখানেই আছে।

এর পাশাপাশি আছে প্রচুর লা-ইয়ানী (বেহুদা কথা ও কাজের) উপকরণ। যাতে আপাতদৃষ্টিতে গুনাহ নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর একসময় তাতে অভ্যস্ত করে ফেলে।

লা-ইয়ানীর কিছু উদাহরণ এমন :

ক. অলস ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ফেসবুক স্ক্রল করা, যদি ছবি বন্ধ থাকে।

খ. অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক স্থাপন, যা সময় নষ্ট করার আরেক উপলক্ষ্য।

গ. বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঘুরঘুর করা, যেখানে অনেক বাতিল ফিকির ও আকীদার ছড়াছড়িও থাকে।

ঘ. অনলাইন মার্কেটগুলোতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট দেখতে থাকা, যেখানে অপ্রয়োজনীয় পণ্যকেও জরুরি হিসেবে প্রচার করা হয়।

ঙ. এই লিংক থেকে ওই লিংক, ওই লিংক থেকে সেই লিংকে ঘুরে ঘুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করা।

একজন ঈমানদারের কাছে তার ঈমান অত্যন্ত মূল্যবান। সে যেকোনো মূল্যে নিজ ঈমানকে হেফাজত করবে। একজন ঈমানদারের জন্য জরুরি হলো, সে এমন কথা বলবে না, এমন কথা শুনবে না, এমন কিছু পড়বে না, এমন জায়গায় যাবে না—যা তার ঈমান-আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইন্টারনেটে এলোমেলো ঘোরাফেরায় তার আমল তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, এমনকি কখনো কখনো ঈমানও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কত পিচ্ছিল গলিপথ এখানে আছে তার হিসেব নেই। হয়তো কোনো এক নাস্তিকের কোনো ব্যতিক্রম কথার ধরনে আমি ফাঁদে পড়ে যেতে পারি। আমার জ্ঞানের কমতির কারণে কোনো বিদআতী, শিয়া বা কাদিয়ানীর খপ্পড়ে পড়ে গোমরাহ হতে পারি। এমন তো হচ্ছেও অহরহ। একজন সচেতন মুমিনকে তো তার ঈমানকে হেফাজতের জন্য

সতর্ক থাকতেই হবে। ঈমানের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো কিছুকে দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করতে হবে।

ফেসবুকে দ্বীন প্রচার

ফেসবুকে বিপুল পরিমাণে জনগোষ্ঠী দিনের একটা বড় সময় কাটায়। আবার দ্বীনদার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশও ফেসবুকে অ্যাকটিভ।

দ্বীনদারদের তিন শ্রেণি ফেসবুকে থাকেন :

প্রথমত উলামায়ে কেরাম, যারা বাস্তব দ্বীনের প্রসার এবং সময়ের সাথে যুক্ত থাকতে এখানে সময় দেন। পাশাপাশি একটি সহজ ও ভালো যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে এর মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বীনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ওই সকল ভাই, যারা আগে জাহেলী জীবন যাপন করতেন। কোনোভাবে দ্বীনের বুঝ পেয়েছেন। দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। তারা পূর্বের অভ্যাস হিসেবে ফেসবুকে সময় কাটাচ্ছেন, পাশাপাশি দাওয়াতী জজবার কারণে এখানে মাশাআল্লাহ দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে এতে উপকৃতও হচ্ছেন।

তৃতীয় শ্রেণি তারা, যারা আগে ফেসবুক চালাতেন না। ইন্টারনেটেও যুক্ত ছিলেন না। দ্বীন মানতে শুরু করার পর একসময় ভাবলেন, ফেসবুকেও দ্বীনি কাজ করা যায়। সে হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে যুক্ত হয়েছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন।

আমরা প্রত্যেকেই জানি, ফেসবুকের ভেতরকার অবস্থা। এখানে যুক্ত থাকার জন্য শরীয়তের কতটা লঙ্ঘন করতে হয় তাও বুঝমানদের কাছে অজানা নয়। শুধু পর্দার ব্যাপারটাই যদি দেখা হয়, অভিজ্ঞরা জানেন, এখানে এই অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্দার ব্যাপক লঙ্ঘনের প্রবল আশঙ্কা আছে। যারা পর্দার পরিবেশে বড় হননি, বা পর্দার দীক্ষা পাননি, তাদের অনেকের কাছে বোধগম্য না হলেও, যারা বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের সোহবত পেয়েছেন, অথবা তাবলীগ জামাত বা কোনো দ্বীনী মেহনতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক

রাখেন, তারা জানেন, এটা কত বড় দ্বীনী ক্ষতি। এই ক্ষতি স্বীকার করে আমি যে এখানে সময় কাটাব, তা আমাকে কতটা দ্বীনী অর্জন এনে দেবে তা হিসেব করতে হবে। আমরা আগে কিছু উদাহরণ এনেছি, সতর্কতার জন্য ওগুলোর ওপর কিছু চিন্তা করাই যথেষ্ট হবে আশা করি।

আর শুধু কি পর্দার সমস্যা? রিয়া, খ্যাতির অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, গীবত, ঝগড়া, মিথ্যা, প্রতারণা, কুৎসা রটনা, 'দ্বীনী' প্রেম... কী নেই এখানে!

ফেসবুক এক বৈচিত্র্যময় জগৎ। এখানে একেকজন মানুষ নিজের সেরাটা উপস্থাপন করে থাকেন। হয়তো কোনো ব্যক্তি অসাধারণ একটা ছবি তার প্রোফাইল পিকচার বানিয়েছে, অন্য কোথাও থেকে কপি করে জটিল নীতিকথা পোস্ট করেছে... এসব দেখে মানুষটা সম্পর্কে কারও উঁচু ধারণা হয়ে যেতে পারে। তার প্রতি কোনো মেয়ে অথবা মানুষটা মেয়ে হলে তার প্রতি একটা ছেলে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা তৈরি হয়ে যায়।

দ্বীনদার মানুষ তার সুন্দরী স্ত্রী রেখে ফেসবুকের কার্যক্রমে প্রভাবিত হয়ে অন্য মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনাও তো এক-দুটো না। বেগানা নারীর সাথে 'নির্দোষ' দ্বীনী আলাপ-আলোচনা কত দ্বীনদার পরিবারে অশান্তি, নির্ঘুম রাত, চোখের পানি, ঝগড়া-বিবাদ টেনে এনেছে, সে হিসেব কে রাখে! স্বামী অসহ্য হয়েও সহ্য করে যাচ্ছে স্ত্রীর দ্বীনী নসীহতে বেগানা পুরুষের লাভ রিয়্যাকশন। তবু কিছুতেই মানা করা যাবে না, স্মার্টফোন ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। এ এক বাস্তবতা—ইন্টারনেটে সবার উপস্থিতি। এ থেকে বঞ্চিত করলে খারাপ দেখায়। জ্বলে-পুড়ে খাক হলেও কিছু করার নেই। এই ইন্টারনেটের ব্যবহার, সে তো দাওয়াতী কাজে। আর আশপাশের এরা দ্বীনী ভাই-বোন। বেগানা হলেও আপন।

ফেসবুকে দাওয়াতী কাজে শুধু রিয়ার আশঙ্কা প্রবল, তা-ই না—মানুষের প্রশংসায় প্রভাবিত হওয়া, লোকের প্রশংসাকে নিজের পক্ষে প্রমাণ ভাবা, নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা তৈরি হওয়া, লাইক-শেয়ারের ফাঁদে পড়া, আরও বেশি লাইক অর্জনের উপযোগী পোস্ট দেয়ার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া, ভক্তকুল দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, একসময় ভক্তকুলের পছন্দ-

অপছন্দের মাধ্যমে চালিত হওয়া, নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে উপস্থাপন করার মানসিকতা তৈরি হওয়া, দ্বীনী পথে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টা তৈরি হওয়া, নিজের নামের পেইজ তৈরির মাধ্যমে নিজেকে পাবলিক ফিগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা[১], দাওয়াহ-পেইজের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ডিং করা, দ্বীনী ট্রলের নামে হাসি-তামাশাকে একটা নিয়মিত ব্যস্ততা বানিয়ে নেয়াসহ এমন জানা-অজানা প্রচুর দ্বীনী ক্ষতি রয়েছে।

ফেসবুকে পরিচিতরা সাক্ষাতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের গীবতে ডুবে যাওয়া একটি বাস্তব সত্য। হয়তো ধরে নেয়া হয়, ফেসবুক আইডিগুলো বাস্তব ব্যক্তিসত্তা নয়, তাই এদের গীবত করা পরিচিতজনদের গীবতের মতো হবে না। কিন্তু বেশির ভাগই দেখা যায়, ফেসবুক কমিউনিটি বাস্তব কমিউনিটির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। দ্বীনী ভাই-বেরাদারের হাঁড়ির খবর, আসল অবস্থা, ফ্যাক্ট—এসবে মশগুল হওয়া একটা স্বাভাবিক চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বীনী বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সময় আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কও হয়ে থাকে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ। হয়তো একজন মুহাদ্দিস সাহেবের মন্তব্যের বিপরীতে তির্যক মন্তব্য করল এমন একজন নবীন দ্বীনদার, যার পুঁজি হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু মুখস্থ কথা। পুরুষদের আলোচনার মাঝখানে একজন নারী অবলীলায় কমেন্ট করে বসছে। নারীদের কমেন্টের মজলিসেও পুরুষরা ঢুকে পড়ছে। ছেলেপেলে গালাগাল দিচ্ছে বাপের বয়সী মানুষকে। দেশবরেণ্য আলেমকে জাহেল-ফাসেক-কাফের পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে-কেউ। এ যেন টঙ্গীবাজারের রোববারের হাট। ভিড়ের মাঝে কে কার পায়ে পাড়া দেবে বোঝার উপায় নেই। পাড়া দিলে এর কোনো দায়ও নেই। কখনো এ নিয়ে কোনো বিচার বসবে না। তাই মাফ চাওয়াচাওয়ির বালাই নেই। ভয়ও নেই।

শয়তানের নেক সুরতের একটা ধোঁকায় অনেকে পড়ে যান—দাওয়াতী ভিডিও বানানো। আহা, দ্বীনী দাওয়াতের নামে নিজের ওপর এমন অত্যাচার আর হতে পারে! একেকটা ভিডিও বানাতে গিয়ে কী পরিমাণ মুভির

১. কেউ প্রয়োজনে পেইজ খুললেই তা যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে ব্যাপারটা এমন নয়; কী বোঝানো হয়েছে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত আছেন।

ক্লিপ দেখতে হয় আল্লাহ মালুম। একেক বাক্যের উপযোগী ছবি ও ভিডিও খুঁজে পেতে নজরের কত শত খেয়ানত করতে হয় তার হিসাব নেই। সার্চ ইঞ্জিনের অবাধ স্রোত কত বেপর্দা ও জঘন্য নারীচিত্র বয়ে আনে, তা ভাবাও যায় না। যদিও মুভি ক্লিপ ছাড়াও ভিডিও বানানো যায়, কিন্তু এমনটা করা হয় কম। বুযুর্গদের বয়ানকে আরও হৃদয়স্পর্শীভাবে তুলে ধরতে একেক কথার সাথে মিলিয়ে ছবি যোগ করা হয়। অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও বানানো হয়। অথচ ওই জিনিস থেকে মানুষ কীভাবে ফায়দা পাবে, যা তৈরি করতে গিয়ে তার নির্মাতাই গুনাহে ডুবে গেছে! আর মানুষ এ থেকে ফায়দা পেলেই-বা নির্মাতার কী লাভ, যদি সে নিজেই গুনাহমুক্ত না থাকতে পারে!

গুনাহযুক্ত এসব দাওয়াতী প্রচেষ্টা থেকে যে কিছু ফায়দা হয় না এমন নয়। তবে এ চক্রে ঘুরতে থাকা মানুষেরা ইবাদতের ধ্যান, অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর স্মরণের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের দাঈ ও মাদঊ (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়) উভয়ই দ্বীনের হাকীকত থেকে দূরেই থেকে যায়; কিছু বাহ্যিকতাকেই দ্বীন ভেবে জীবন কাটিয়ে দেয়।

০৫.

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে দূরে গেলে নগদ প্রাপ্তি

০১. প্রশান্ত অন্তর

একজন মুসলমান যখন গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলে মগ্ন থাকে, তার অন্তর প্রশান্ত হয়। অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার অভ্যাসের কারণে তার হৃদয়ে ইবাদত ও যিকির গভীর রেখাপাত করে। আল্লাহর নাম শুনলে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় দিল সিক্ত হয়। আল্লাহর নৈকট্য সে হাসিল করতে থাকে।

একজন মানুষ যখন স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটে লিপ্ত থাকে, তার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অসংখ্য গুনাহ হতে থাকে, দিলে গুনাহের কালিমা লাগতে থাকে। গুনাহের এই ধুলো-ময়লা তার হৃদয়কে শক্ত করে দেয়। তাওবাহীন গুনাহ দিলকে পাথরের মতো শক্ত এবং কয়লার মতো কালো করে দেয়। অন্তর অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহর কথা, নবীজীর কথা, আখিরাতের কথা তার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। যদি সে এ সময় অভ্যস্ততার কারণে আমল জারিও রাখে, সে আমলে থাকে না কোনো প্রাণ। সে ইবাদত হয় নিছক কিছু রুসম-রেওয়াজের মতো প্রথাপালন। চোখ আল্লাহর কাছে কাঁদতে ভুলে যায়। জিহ্বা বঞ্চিত হয় যিকির ও তিলাওয়াতের স্বাদ থেকে। হৃদয়ে থাকে না প্রশান্তি বলে কোনো কিছু। এ যেন এক মৃত অন্তর।

অনলাইনে ব্যস্ত থাকা হৃদয়ের একাগ্রতা নষ্ট করে। দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত মানুষও এর গুরুত্ব বোঝে। তাই পরামর্শ দেয়া হয় মাঝে মাঝে স্ক্রিন থেকে চোখকে দূরে রেখে কিছুটা আরাম দেয়ার। স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা অন্তরের প্রশান্তি দূর করে দেয়।

গুনাহ ছাড়াও এখানে বিপুল তথ্যের অবিন্যস্ত ছড়াছড়ি মানব-হৃদয়কে অস্থির করে তোলে। একজন মানুষ যদি শুধু দ্বীনী লেখাজোখা পড়েও সময় কাটায়, তবু এই অগোছালো পরিবেশই একজন মানুষকে অশান্তিতে ফেলার জন্য যথেষ্ট। কেউ যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ক্রল করতে থাকে, একের পর এক বিষয় সামনে আসতে থাকে—জাতীয় ইস্যু, অপরাধ, আন্তর্জাতিক আলোচনা, রাজনীতি, বেহুদা কথাবার্তা, কৌতুক, তর্ক-বিতর্ক, অনুপ্রেরণামূলক দ্বীনী লেখা...। অন্তর স্থিরতা পছন্দ করে। স্থির অন্তর নিয়ে করা আমলে ধ্যান আসে। আমল করে শান্তি পাওয়া যায়। আর এত এত বিষয় নিয়ে যখন কেউ রাতদিন ব্যস্ত থাকবে, স্বাভাবিকভাবেই তার দিলে কিছু পেরেশানী থাকবে। আর এই পেরেশানী তার আমলকে প্রভাবিত করবে। অনলাইনের তর্ক-বিতর্ক, বৈচিত্র্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার রেশ নামাজ, যিকির-তিলাওয়াতেও রয়ে যায়।

প্রশান্ত একটা অন্তর পেতে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের জাল থেকে বেরোনো জরুরি। এটা খুব স্পষ্ট ব্যাপার। আর সাধারণভাবে সবাই এটা স্বীকারও করে থাকেন, এসব ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকলে অন্তর ঠান্ডা থাকে। যেকোনো আগ্রহী ব্যক্তি সপ্তাহখানেক অফলাইনে থাকলেই এর বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করা যায়।

অ্যানালগ জীবনে বাড়তি চাপ থাকবে না। অহেতুক পেরেশানী থাকবে না। যে ব্যাপারগুলো জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তা সম্পর্কে বায়বীয় চিন্তায় দিনমান এক করতে হবে না। অজানা-অচেনা কারও তির্যক মন্তব্যের উচিত জবাব দেয়া নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। ছড়ানো-ছিটানো বিপুল তথ্য অন্তরকে এলোমেলো করে দেবে না।

প্রভাবহীন ও প্রশান্ত একটা হৃদয় পাওয়া যাবে। গুনাহ ও অহেতুক ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকায় অন্তর হবে নরম। অল্প কথায়, অল্প চিন্তায় দিল গলে যাবে। কুরআন-হাদীসের দাওয়াত সহজে হৃদয়ঙ্গম হবে। গভীরে আছর করবে। প্রভাব রবে দীর্ঘদিন। সহজে চোখে পানি আসবে। আমলের দ্বারাও ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি

পাবে। জীবন আবার সবুজ হবে। আমলের পথ হবে মসৃণ। আমলের বাগানে গাছে গাছে ফুল ফুটবে। মৌমাছি উড়ে বেড়াবে। গুনগুন করবে। শীতল বাতাসে দেহমন জুড়াবে।

০২. ইলম অর্জনের সুযোগ

অনলাইনে ইলমের ছড়াছড়ি। সঠিকভাবে বললে ইলম নয়, তথ্যের ছড়াছড়ি। প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করে ইলম অর্জনের নিয়তে। দ্বীনী গ্রুপগুলোতে, ইসলামী বইয়ের গ্রুপগুলোতে অনেকেই ইলম-সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পেয়ে যান। যে পরিমাণে ইলম শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা অনলাইনে হয়ে থাকে, বাস্তবে 'ইলম শিক্ষা' সে তুলনায় খুবই কম।

- কীভাবে আরবী শিখব
- কীভাবে কুরআন শিখব
- কীভাবে ফিকহ্ শিখব
- কীভাবে তাফসীর পড়ব
- কীভাবে সীরাত সম্পর্কে জানব

এ সবই এমন কিছু কমন প্রশ্ন, যা বারেবার অনলাইনে এসে থাকে। কিন্তু যদি জরিপ করা হয়, কত জন পরামর্শ পেয়ে সে অনুযায়ী এই বিষয়গুলো শিখেছে বা শিখছে—দুঃখজনকভাবে ইতিবাচক তথ্য খুব কমই পাওয়া যাবে।

বেহুদা প্রশ্নের অভ্যাস অনেকেরই আছে। অনেকেই শুধু শুধু এসব প্রশ্ন করবে, কিন্তু আমল করবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক মানুষ এমন আছেন, যারা সত্যিই ইলম শিখতে চান—বুঝেশুঝেই প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তারাও ইলম শেখায় সময় দিতে পারছেন না। তাদের হাতে সময়-সুযোগ-আগ্রহ সবই ছিল। কিন্তু এমন এক কারণ তাদের বাধাগ্রস্ত করেছে, যা আদতে কোনো কারণই নয়। কিন্তু আজ এটা অনেক বড় এক বাস্তবতা এবং সত্য এক 'কারণ' হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই কারণ হলো অনলাইনে অলস সময় কাটানো।

প্রচুর মানুষ সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ও উদ্দেশ্য ছাড়াই অনলাইনে থাকে। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাকে সময় কাটানোর একটা উপকরণ হিসেবে নিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এতে ফেঁসে যায়। মোবাইল চালাতে চালাতে একসময় মোবাইলই তাকে চালানো শুরু করে।

তো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুদা স্ক্রল করা, ইউটিউবে ভিডিওর পর ভিডিও দেখা সম্ভব হয়, কিন্তু ইলম শেখার জন্য কিছু সময় ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ফুরসত মেলে না। এর মূল কারণ হলো, অনলাইন তার সময়কে খেয়ে ফেলছে। দৈনিক একটা বড় সময় যদি এখানে খরচ হয়ে যায়, তাহলে ব্যক্তিগত অন্যান্য ব্যস্ততা সারার পর সে ইলম অর্জনের জন্য সময়টা পাবে কোথায়!

একজন মানুষ স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট ত্যাগ করে অ্যানালগ জীবনে ফিরে গেলে সে প্রচুর সময় ফিরে পাবে, যা সে ইলম অর্জনে ব্যয় করতে পারবে। আর এ সময়ে অল্প মেহনতে বেশি শেখা সম্ভব। কারণ, অনলাইন ব্যস্ততা শুধু সময় নিয়ে নেয় তা-ই না, দিল-দেমাগ পেরেশান করে রাখে। তাই স্মার্টফোনে আসক্ত ছাত্রদের তুলনায় অন্যরা পড়াশোনায় ভালো করে।

০৩. আমল করার সুযোগ

অনলাইনে বিভিন্ন ফোরাম ও ফেসবুক গ্রুপে নিজেকে আরও উন্নততর ইলমের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা, আরও গভীর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, এক-এক বিষয়ে বিস্তারিত ইলম অর্জন করা, নতুন আমল শেখা, আল্লাহওয়ালাদের বিভিন্ন আমলের আলোচনা ও তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করা, বুযুর্গদের আমলী জীবনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে জানা নিয়ে অনেকের আগ্রহ প্রকাশ পায়। পরামর্শ ও তথ্যগুলো খুব সহজে মানুষ পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, এখানে মানুষ যা শিখে থাকে, তার খুব সামান্যই আমল করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব কথাবার্তা হয়ে থাকে কেবলই আলোচনা। সময় কাটানোর একটা বিশেষ পদ্ধতি। যদিও এটা দুনিয়াবি ব্যস্ততা থেকে ভালো, কিন্তু এ থেকে যে পরিমাণ অর্জন করার কথা ছিল, সামগ্রিক চিত্র সে তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

'কেন আমরা আমল করছি না' এই প্রশ্নের জবাবে অলসতা, উদাসীনতা, আমলের আগ্রহে ঘাটতিকে দায়ী করা যায়। এটা বাস্তবও। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও বড় কারণ হলো, মানুষের আমল করার সময় নেই। দৈনন্দিন আমলগুলো করার জন্য একটা মিনিমাম সময় প্রয়োজন। কিন্তু দিনে যে মানুষটার কয়েক ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে স্মার্টফোনে, সে নিজের অন্যান্য কাজ ঠিক রেখে বাড়তি আমল করার ফুরসত কোথায় পাবে!

স্যোশাল মিডিয়ায় কয়েক ঘণ্টার ব্যস্ততা শেষ করতে করতে গভীর রাত হয়ে যাবে। তখন মনের মধ্যে ফজরের আগে ওঠার তাড়া তৈরি হবে। কেউ উঠতে পারবে, কেউ পারবে না। ফজরের পর লম্বা ঘুম অনিবার্য হবে। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে অনেকের দিনের অর্ধেক শেষ। দৈনন্দিন কাজগুলো সারতে সারতে বাকি দিন পার হবে। এর মধ্যে আবার স্যোশাল মিডিয়ার ক্ষুধা তৈরি হবে। বিভিন্ন ইস্যুতে মনোযোগ দিতে গিয়ে দেখতে দেখতে আবার মধ্যরাত। আবার ফজরের নামাজের তাড়া—চক্র চলতে থাকবে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নিয়মিত গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকার পরেও তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না!

০৪. পরিবারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন

বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে চার জন ঘরের চার কোনায় চারটা স্মার্টফোন নিয়ে বসে আছে। সবাই একটা ঘরেই বসে আছে। কিন্তু বহু বহু দূরে। এ চিত্র এখন ঘরে ঘরে। পরিবারের সদস্যদের নিজেদের ভেতরকার সম্পর্ক গভীর থাকছে না। পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধেও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

দ্বীনদার লোকজনও অতিরিক্ত অনলাইন ব্যস্ততার কারণে পরিবারের সাথে সময় দিতে পারেন না। ঘরের কাজে কিছু সাহায্য করা, বাচ্চাদের সময় দেয়া, শিশুদের সাথে একটু খেলাধুলা করা, ওদের পড়াশোনার খবর রাখা, পরিবারের লোকদের দ্বীনী তারবিয়াত বিষয়ে খোঁজ নেয়া, ঘরে নিয়মিত তালীম করা... এ সব কাজের দিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না। সে সময় স্মার্টফোনে খরচ হয়ে যায়। টাইমলাইনের গরম গরম স্ট্যাটাস পড়তে, তর্ক-বিতর্ক করতে

আর আরও বেশি 'গুরুত্বপূর্ণ' পোস্ট লিখতে গিয়ে এই কাজগুলোর সুযোগ মেলে না।

স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকে মনোযোগ সরালে এ ধরনের দায়িত্বগুলো পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। আর ধীরে ধীরে দায়িত্বগুলো আদায় করাও হয়ে উঠবে।

০৫. জমে থাকা কাজ করা

স্মার্টফোনের স্ক্রিন একটা ভিন্ন জগৎ। এখানে মগ্ন হয়ে পড়লে মানুষ তার অনেক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে পড়ে। প্রতিটি মানুষেরই বিভিন্ন জমে থাকা কাজ থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, নিজস্ব খুঁটিনাটি বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন দ্বীনী প্রোগ্রামে যোগ দেয়া, বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, জরুরি কোনো বই পড়া ইত্যাদি। কিন্তু একজন স্মার্টফোন-আসক্ত ব্যক্তি সাধারণত এসবের সুযোগ পান না। আত্মীয়ের খোঁজখবর রাখার চাইতে অনলাইনে পরিচিতদের খোঁজখবর রাখার প্রতি তার মনোযোগ থাকে বেশি। মন পড়ে থাকে ডিভাইসে।

এই আসক্তি থেকে বাঁচতে পারলে এসব কাজ করার আগ্রহ ও সুযোগ দুটোই পাওয়া যায়। শরীর-চর্চা, বাগান করা, ভ্রমণ, পরিবারকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া, ঘরদোর ও নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজে মনোযোগ বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

০৬. এলাকায় দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ

অনলাইনে সহজে মানুষকে দাওয়াত পৌঁছান যায় এটা যেমন সত্য, একইভাবে গুনাহের পরিবেশে দাওয়াতের প্রভাব খুবই কম হয়, তাও সত্য। অনেক কাজ করেও ফল পাওয়া যায় অল্প। কাজের মধ্যে বাহ্যিকতার পরিমাণ থাকে অনেক। এমনকি অনেক সময় সেখানে রিয়ার উপস্থিতিও থাকে।

অফলাইনে কত হাজারো মানুষ আছে, যাদের কাছে অনলাইনে দাওয়াত দেয়া সম্ভব হয় না। এটা অনলাইন দাওয়াতের একটা দুর্বল দিক।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনলাইনের বাইরের দাওয়াতী পরিমণ্ডলের কথা থাকে হিসাবের বাইরে। অথচ এত বড় একটা অঙ্গন সম্পর্কে নীরব থেকে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব না।

অনলাইনে দাওয়াতের তুলনায় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা হয় বেশি। এ কারণে সাধারণত ধারাবাহিক দাওয়াতী কাজ কমই হয়ে থাকে। মাসের পর মাস কেটে যায়, দিনরাত অনলাইনে কাজ চলছে, অথচ পাশের বাসার মানুষটা বেনামাজী জীবন কাটালেও তা নিয়ে ভাবা হয় না। সমাজের একদম গরিব ও শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষগুলো নিয়ে কাজ করার আগ্রহও তৈরি হয় না। এর মূল কারণ হলো, অনলাইনের বাইরের দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা। একজন মানুষ বাস করছে সমাজে, অথচ সমাজের সাথে তার সঠিক যোগাযোগ নেই।

অনলাইনে দাওয়াতের প্রয়োজন নেই এমন না। দরকার অবশ্যই আছে। কিছু মানুষ দাওয়াতের নিয়তে কাজ করতে পারে, এবং তা করবেও। কিন্তু একেই সব বানিয়ে নেবে না। ডুবে যাবে না, ডুবে থাকবে না। কারণ, প্রতিটি মানুষ অনলাইনে না থাকলেও প্রতিটি মানুষেরই অফলাইনে অস্তিত্ব আছে। তাই অনলাইনের তুলনায় অফলাইনে দাওয়াতী কাজ করতে হবে অনেক অনেক বেশি। আর এ সবই সম্ভব হবে, যখন স্মার্টফোনের স্ক্রিনের ব্যস্ততা কমিয়ে বাইরের দুনিয়াটা ভালো করে দেখা হবে। জানালা খুলে দেয়া হবে। আলো আসবে। ঘর থেকে গুমোট ভাব দূর হবে। মাঝে মাঝে মুক্ত বাতাসে হাঁটতে বের হওয়া হবে।

০৬.

এ আসক্তি থেকে বাঁচার উপায়

ইমাম গাযালী রহ. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনে লিখেছেন,

"খাহেশের চরম পর্যায়ে পৌঁছার নামই প্রেম, যা চিন্তাশূন্য অন্তরের রোগ। শুরুতেই তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ তার প্রতি দৃষ্টিপাত কমিয়ে দেবে, তার প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেবে, নাহয় যখন মনোযোগ বেড়ে যাবে, তখন সরানো মুশকিল হয়ে যাবে। আর শুরুতে তা অনেক সহজ। প্রত্যেক জিনিসের প্রতি এশক বা প্রেমের একই অবস্থা। যেমন : ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, জায়গা-জমিন, সন্তান-সন্ততি, এমনকি পাখি (কবুতর ইত্যাদি) দিয়ে খেলা করা এবং দাবা ইত্যাদি খেলারও একই অবস্থা। এসব জিনিস যখন মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসে, তখন তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কেই বরবাদ করে দেয়। এর দৃষ্টান্ত এমন : যেমন কোনো ব্যক্তি পশুর ওপর সওয়ার হলো, পশু ভুল পথে যেতে চাইলে সওয়ারী ব্যক্তি যদি সাথে সাথে লাগাম টেনে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সহজেই তা সঠিক পথে চলতে পারে। কিন্তু পশু যদি ভুল পথে ঢুকে পড়ে, তারপর সওয়ারী ব্যক্তি যদি সেটির লেজ ধরে আবার পেছনের দিকে টানতে চায়, তবে তা ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন হয়ে পড়বে। কাজেই এসব জিনিসের মহব্বতের প্রতি শুরুতেই দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন সীমা অতিক্রম করতে না পারে।"

যেকোনো আসক্তিই সাধারণত একটু একটু করে একজন মানুষকে গ্রাস করে নেয়। হঠাৎ ঘায়েল করে না, আবার হঠাৎ করে চলেও যায় না। এই আসক্তি অল্প সময়েই দূর হয়ে যাবে এমনটা ভাবা ভুল। চেষ্টাটা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। বিরতিহীন চেষ্টা চললে আসক্তিটা ধীরে ধীরে হলেও দূর হবে। একবারে হবে না, দুই-চার বারেও হবে না। তবে হবে। এটা সম্ভব। যারা

নিরলস চেষ্টা করেছে তারা সফল হয়েছে। কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে সাধারণত মানুষ আত্মসমর্পণ করে বসে। অনেকে একে নিয়তির লিখন ধরে নেয়। কিন্তু এখানে তো আত্মসমর্পণের সুযোগ নেই। এ ব্যাধি থেকে যে বাঁচতেই হবে। এই চেষ্টা থেকে ছুটি হতে পারে না। আমাকে তো শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করেই যেতে হবে। আর সত্যি কথা হলো, এই লড়াইটা দীর্ঘমেয়াদি নয়। কেউ যদি নিয়ম মেনে চলে, সে খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। আর যে নিয়মে যত অবহেলা করবে, তার লক্ষ্য অর্জন তত সুদূর পরাহত।

আমি বোধহয় পারব না

এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের চারপাশের অবস্থা দেখে মনে হতে পারে, এ যুগে স্মার্টফোন-ইন্টারনেট, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে স্যোশাল মিডিয়া ছাড়া চলা একপ্রকার অসম্ভবই। কিন্তু মরিয়া হয়ে যখন কেউ চেষ্টা করে, তখন অসাধ্যও সাধিত হয়। আর এ সময়েও এমন অনেক আধুনিক মানুষ আছেন, যারা নিজের কাজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে এসব ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকেন। তারাও সামাজিক মানুষ। তাদেরও প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, স্যোশাল মিডিয়া আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়।

আমার সন্তানরা পর্নোগ্রাফিতে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে বড় হবে, এটা কি মেনে নেয়া সম্ভব? এমন একটা জীবনধারাকে কি আমি স্বীকৃতি দিতে পারি? আমি কি মেনে নিতে পারি এমন একটা রেওয়াজকে, যেখানে অশ্লীলতা একটা স্বাভাবিক বাস্তবতা! যদি তা না হয়, তাহলে তো আমাকে নিজ পরিবারের জন্য নতুন একটা ধারা তৈরি করে যেতে হবে, যেখানে এসবের সম্ভাবনা ও উপকরণগুলোকে অস্বীকার করা হবে। এগুলোকে ভর্ৎসনা করা হবে। ভুল ধারা হিসেবে দেখা হবে। কোনোভাবেই মেনে নেয়া হবে না।

যোগাযোগমাধ্যম

কিছু মানুষের কাজই অনলাইনভিত্তিক, আবার কিছু মানুষকে কাজের প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। শুধু প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। কারও দরকার থাকতেই পারে। মানুষ যখন একান্ত পেশাগত

কারণে এবং নিছক কোনো দরকারে অনলাইনে আসে, তার ব্যবহারের ধরন খুব সুনির্দিষ্ট হয়। সে জানে তাকে কী করতে হবে। যদি এর সাথে শরঈ সতর্কতাটুকু যুক্ত থাকে, তাহলে তার থেকে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। যদিও এরপরেও কিছু সমস্যা থাকবে, সে ক্ষেত্রে এটুকু বলা যায়, যে মানুষটা এ ব্যাপারে আন্তরিক হবে, সে অনেক সতর্ক থাকবে এবং তার গুনাহ থেকে বাঁচার পথ সে নিজেই বের করে ফেলবে। হয়তো বিশেষ কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করবে, নাহয় ইমেজ অফ রাখবে... এ বিষয়ে সে-ই ভালো জানবে।

যদি শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে ই-মেইল বা এ ধরনের নীরস কিছু ব্যবহার করা উচিত, যাতে সময় নষ্ট করার উপকরণ কম থাকে।

আমি কি আসক্ত?

আমি আসক্ত কি না তা কয়েকভাবে যাচাই করা যেতে পারে।

- আমি যখন চাই তখনই হাত থেকে ফোন রেখে দিতে পারি কি না।
- ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ফোন চালু করে নোটিফিকেশন চেক করার তাড়া অনুভব করি কি না।
- জরুরি কাজগুলো অবহেলিত হচ্ছে কি না।
- আমি যেসব সাইটকে ক্ষতিকর মনে করি, সে সাইটগুলো থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে পারি কি না।
- স্মার্টফোন চালানোর সময় আমার সময়জ্ঞান থাকে কি না।

প্রবল আসক্তি সৃষ্টিকারী সাইটগুলো এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে যদি বেশ কয়েক বার আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হই, বারেবার এমন সাইটে প্রবেশ করতে বাধ্য হই, তখন বুঝতে হবে আমি আসক্তির পথে আছি। সেটা ফেসবুক হোক, অন্য কোনো নোংরা সাইট হোক, অথবা হোক ইউটিউব আর নিউজ সাইট। সবগুলোই আসক্তি তৈরি করতে পারে।

আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করা

আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করা আসক্তি দূর করার অভিযানে অত্যন্ত সহায়ক। আখিরাতের আশা ও ভয়, কবরের কঠোর শাস্তির ভয়, জাহান্নামের শঙ্কা মানুষের ভেতর পাকাপোক্ত প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি করে, যা শয়তানের পক্ষে নষ্ট করা কঠিন হয়। আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিতে সাময়িক কিছু উপকার দেখা গেলেও তা দীর্ঘমেয়াদে সাধারণত কাজ করে না।

এখানে একটা জরুরি কথা হলো, মানুষের ভেতরকার আল্লাহর ভয়ও তো বাড়ে-কমে। সব সময় এক অবস্থায় থাকে না। যখন আল্লাহর ভয় কম থাকবে তখন গুনাহের আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। এটা বাস্তব। এমনই হয়ে থাকে। তাই এমন কোনো পথ অবলম্বন করতে হবে, যেন একটা মিনিমাম তাকওয়া সব সময় বজায় থাকে। ঈমানী স্তর যেন এর নিচে না নামে।

এর কার্যকর উপায় অনেক। সুনির্দিষ্ট কোনো উপায় এখানে জরুরি মনে করা ভুল এবং সবার জন্য এক পদ্ধতি কাজে দেবে তাও ঠিক না। কারণ, সবার রুচি-প্রকৃতি আর সুযোগ-সুবিধা সমান নয়।

কিছু উপকারী কর্মপন্থা হতে পারে এমন :

- উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়মিত বসা।
- তাবলীগ বা অন্য যেকোনো দ্বীনী মজলিস, যেখানে আখিরাতের আলোচনা হয়, সেখানে নিয়মিত সময় দেয়া।
- মাঝে মাঝে কিছু সময় নিয়ে তাবলীগে যাওয়া যেতে পারে; লম্বা একটা সময় গুনাহ থেকে দূরে থেকে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি খুব ভালো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।
- বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য গ্রহণকে নেয়ামত মনে করা। আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁদের কাছে নিজেকে পেশ করা।
- নিয়মিত আখিরাত-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা করা।
- আখিরাত-সংক্রান্ত কিতাবাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করা।

- যিকির-আযকার ও দুআ নিয়মিত করা।
- কুরআনে কারীমের আখিরাত-সংক্রান্ত সূরাগুলোর অর্থ ধ্যানের সাথে পড়া।

যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা), রিকাক (হৃদয় গলানো আলোচনা) ও আখিরাত-সংক্রান্ত এমন কিছু বই নির্দিষ্ট করে নেয়া, যা প্রতিদিন কিছু হলেও পড়া হবে। এটা এমন এক শক্তি, যা মানুষকে দ্বীনের ওপর অটল থাকতে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সহায়ক হয়।

পর্নো-আসক্তি থেকে বাঁচার উপায়[২]

ডিভাইস ত্যাগ না করে পর্নোগ্রাফি ত্যাগের ব্যাপারে যত পরামর্শই নেয়া হোক, তা খুব অল্পই কার্যকর হয়। যখন একজন মানুষের হাতে স্মার্টফোন আছে, ইন্টারনেট আছে, এ অবস্থায় তাকে যত মোটিভেশনই দেয়া হোক না কেন, মাঝে মাঝে তার এমন কিছু সময় আসবে, যখন কোনো বাধাই আর তাকে থামাতে পারবে না। হ্যাঁ, ডিভাইস হাতে না থাকলেও আসক্তি চরমে উঠলে যেকোনোভাবে ডিভাইসের বন্দোবস্ত একজন মানুষ করে ফেলতে পারে। কারণ, যৌন উন্মাদনা এমন এক উত্তাল তরঙ্গ, যা বাঁধ দিয়ে থামিয়ে রাখা যায় না। তবে হাতের কাছে উপকরণ না থাকলে এর পরিমাণটা কমে আসবে। আর একসময় এই প্রবণতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। কিন্তু ডিভাইস হাতে রেখে শুধু মোটিভেশন ও চর্চা কাজে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে মোটেও কাজে আসে না।

আসক্তির শুরুতেই এর লাগাম টেনে ধরা। কারণ, যেকোনো আসক্তি শুরুতে তেমন শক্তিশালী থাকে না। দিন যত যায়, সেটি তত জোরালো হতে থাকে। তাই শুরুর দিকে ব্যাপারটা নিজেকে বোঝাতে হবে, এ এক চোরাবালি। আমি এতে যত বেশি ডুবব, বের হওয়া তত কঠিন—একপর্যায়ে অসম্ভব হয়ে যাবে। যা করার এখনই করতে হবে।

---

২ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পড়া যেতে পারে : ঘুরে দাঁড়াও, ওয়াফি পাবলিকেশন; মুক্ত বাতাসের খোঁজে, ইলমহাউজ পাবলিকেশন।

অফলাইনে ব্যস্ততা বাড়ানো একটা ভালো উপায়। অফলাইনে এমন কিছু কাজের আগ্রহ তৈরি করা, যার প্রতি দিল-দেমাগ আচ্ছন্ন থাকবে। বই পড়া, খেলাধুলা করা, ভ্রমণ করা, বাগান করা, শরীরচর্চা করা, রান্না করা, ডায়রি লেখা, চিঠি লেখা...। এসবে ব্যস্ত থাকলে যখন-তখন সময়-সুযোগ পেলেই পর্নোগ্রাফিতে মশগুল হওয়া হবে না। যথাসম্ভব সময়গুলো অন্যান্য কাজে খরচ হতে দিতে হবে।

ফোনে প্রচুর ইন্টারনেট ডাটা থাকা একটা বড় সমস্যা। ছোট ছোট প্যাকেজ ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি ব্যবহার করতে হবে স্লো ইন্টারনেট। পুরো প্রক্রিয়াটা বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করতে হবে।

অন্তরে প্ররোচনা তৈরি করার উপাদানগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কারণ, সামান্য একটা চিত্রও দিলে শক্তিশালী ঢেউ তৈরি করতে পারে। এ জন্য মাথা নিচু করে রাস্তায় চলা, নজরের হেফাজতের খুঁটিনাটির প্রতিও মনোযোগী থাকা, খবরের কাগজ পড়লে সাবধানতা অবলম্বন করা— উত্তেজনা তৈরিকারী নিউজ ও ছবি থেকে সতর্ক থাকা, যেসব বইতে অশালীন সুড়সুড়িপূর্ণ আলোচনা থাকে, সেসব থেকে বেঁচে থাকা। এর বাইরে এ ধরনের অসংখ্য-অগণিত উপাদান রয়েছে। নিজে নিজে সেসব চিহ্নিত করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

কৌতূহলহীন চোখ

কৌতূহলহীন অন্তর

কৌতূহল এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলে। কৌতূহলকে ব্যবহার করে রাস্তায় চলার সময় মানুষকে বাধ্য করে রিকশা বা গাড়ির ভেতর উঁকি দিতে। ইউটিউবের শিরোনাম দেখে ভেতরে ঢুকতে আগ্রহী করে। ফেসবুকের বিভিন্ন মেয়ে আইডির প্রতি আকৃষ্ট করে। অপ্রয়োজনে মেয়েদের আইডিতে ভ্রমণ করিয়ে ধীরে ধীরে পথভ্রষ্ট করে এই মোহযুক্ত কৌতূহল।

তো, যে চাইবে নজরের হেফাজত করতে, অনলাইনে গুনাহমুক্ত থাকতে, তাকে কৌতূহলের ঘাড়ে পাড়া দিতে হবে। সকল আগ্রহকে মাটিচাপা দিতে হবে। পুরোপুরি অমনোযোগী থাকতে হবে এমন সকল বিষয় থেকে। ফেসবুক আর ইউটিউবের চলমান ইস্যুগুলো সম্পর্কে বেখবর থাকতে হবে। সব জানতে চাওয়া, সব দেখতে চাওয়া, সব বুঝতে চাওয়াই সেই পথের শুরু, যার শেষে অপেক্ষা করছে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার চূড়ান্ত ময়দান।

ইউটিউব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল প্রায় সবারই এই অভিজ্ঞতা থাকার কথা, যেখানে দর্শক হয়তো একটা দ্বীনী বয়ানের ভিডিও দিয়ে তার সময়টা শুরু করেছিল, কিন্তু রিলেটেড ভিডিও লাফিয়ে লাফিয়ে ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। বদলাতে বদলাতে একসময় দর্শক অবাক হয়ে খেয়াল করল, যে বিষয় দিয়ে সে শুরু করেছিল, তার সাথে বর্তমান ভিডিওর কোনো মিলই নেই। সে হয়তো সামান্য সময়ের জন্য কৌতূহলের বশে ছোট একটা অপ্রাসঙ্গিক ভিডিও দেখা শুরু করেছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেল তিনি বহুদূর চলে গেছেন। তাই কৌতূহলকে শুরু থেকেই দমিয়ে রাখতে হবে।

অমনোযোগী হওয়া অমনোযোগী হওয়া

আগ্রহকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা

কৌতূহলকে ছুটি দেয়া

একনজরে

- শুরুতেই লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করা।
- অফলাইন ব্যস্ততা বাড়ানো।
- ডিভাইস দূরে রাখা।
- অল্প পরিমাণ ইন্টারনেট কেনা।
- স্লো ইন্টারনেট ব্যবহার করা।
- একান্ত দরকার না হলে ইমেজ অফ করে ব্রাউজার চালানো।

- রাতে ফোন পাশে না রাখা।
- একা সময় না কাটানো।
- যিকির-তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরকে শীতল রাখার চেষ্টা করা।
- আল্লাহর কাছে দুআ করা।
- ডিভাইস ত্যাগ করা।
- সকালে-বিকেলে ঘুরতে বের হওয়া।
- সময়মতো ঘুমানো, পর্যাপ্ত ঘুমানো।

হৃদয় যখন ফুটন্ত কড়াই

কিছু সময় থাকে, যখন মানুষ প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পর্নোগ্রাফির সাগরে ডুবে থাকে। বিভিন্ন ব্লগ ও ফেসবুক গ্রুপে এ ধরনের পরিস্থিতিতে আক্রান্ত কিছু মানুষের দেখা মেলে, যিনি এ সমস্যার সমাধান চান কিন্তু এ জন্য মেহনত করার মিনিমাম মানসিক শক্তি রাখেন না। এমন ব্যক্তি, যিনি এই গুনাহের সামনে নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করেই আছেন। সে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তো রাখেই না, এমনকি ইচ্ছাও রাখে না। সে মেনে নিয়েছে এই নিয়তিকে—অনেক চেষ্টা করেছি; বারেবার হোঁচট খেতে খেতে আজ আমি ক্লান্ত।

হয়তো কোনো কথা শুনে, উত্তেজক কোনো কিছু দেখে, নাহয় সামান্য একটা লেখা পড়ে তার দিলের ভেতরটা যৌন উন্মাদনায় টগবগ করে ফুটছে। সে ভেতরে ভেতরে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। সেই নোংরামিতে আজ সে জড়াবেই। সেই কালিমায় নিজেকে আজ ডোবাবেই। নিস্তার তার নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যখন একজন মানুষ বারেবার পড়ে, একসময় হাল ছেড়ে দেয়। হতাশায় ডুবে যায়।

এই পরিস্থিতিটা থেকেও বের হওয়ার পথ থাকতে পারে তা সে নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারে না। অথচ সুনির্দিষ্ট একটা পথ যদি অনুসরণ করে, আশা করা যায় আল্লাহর ইচ্ছায় সে মুক্তি পাবেই। সে পদ্ধতি

রাতারাতি নিজেকে বদলে ফেলার মতো কোনো জাদুকরী ব্যাপার নয়। এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মেহনতের পথ। এ পথ একটু একটু করে উন্নতি করার পথ, এগিয়ে যাওয়ার পথ।

নিজেকে ধরে নিতে হবে একটা বরফের তৈরি মানুষ। যদি আমি গরম তাপমাত্রায় যাই, তাহলে আমি গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাব। আমি যদি নিজেকে বাঁচাতে চাই, আমাকে থাকতে হবে শীতল পরিবেশে। এমন তাপমাত্রায়, যেখানে আমি নিরাপদ। যেখানে আমি গলে যাব না।

একই ভাবে আমি যদি গুনাহের পরিবেশ, অশ্লীল বইপত্র, অডিও-ভিডিওর পরিবেশে যাই, তাহলে আমার গুনাহের প্রভাবে আমার অন্তর অস্থির হবে, উত্তপ্ত হবে। এ অবস্থা আমাকে নেকি থেকে দূরে নেবে। গুনাহের আরও নিকটবর্তী করে দেবে। আর যদি আমি নেকির পরিবেশে থাকি, অন্তর স্থির ও শীতল থাকবে। এতে অন্তর আমলের প্রতি আগ্রহী হবে। গুনাহ করতে মন চাইবে না।

হয়তো এই প্র্যাক্টিসের শুরুতে আমি নিজেকে গুনাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচাতে পারব না, দুয়েকবার পা পিছলে যাবে। গুনাহ হয়েই যাবে। কিন্তু আমার চেষ্টা থাকবে যতটা সম্ভব গুনাহের পরিবেশ থেকে দূরে থাকার, নেকির পরিবেশে বেশি বেশি থাকার। মৃত্যু, কবরের সওয়াল-জবাব, আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো, জাহান্নামের ভয়াবহতা, গুনাহের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি-সংক্রান্ত বইপত্রে নিজেকে সব সময় মগ্ন রাখা। এ-সংক্রান্ত বয়ান শোনা, এরই আলোচনায় নিজেকে মগ্ন রাখা। দুআ-যিকির-তিলাওয়াত নিয়মিত আদায় করা।

এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আমি যদি এই গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই, আমাকে এই ব্যবস্থাপত্র মেনে চলতেই হবে। যতটা গাফলতি করব, ধীরে ধীরে আবার নিমজ্জিত হব সেই গুনাহের নাপাকিতে। যত নিয়মমতো চলব, নিজের অন্তরে নেকির নূর প্রবেশ করবে। আমি আরও বেশি শক্তিশালী হব। গুনাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়াও হবে অনেক আসান। এর বিপরীত করলে অন্তরের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। দুর্বল হয়ে যাব। হতাশা আবার আঁকড়ে ধরবে।

রাতারাতি অন্তরের শক্তি চলে আসবে এমনটা ভাবা ভুল। হয়তো কিছুটা সময় লাগতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্তরে নূরানী শক্তি প্রাধান্য লাভ করবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও অমনোযোগিতা চলে আসবে। খেয়ালই আসবে না, অথবা আসলেও তা হবে দুর্বল কামনা। গুনাহ পর্যন্ত যাওয়া হবে না। আর যদি দ্বীনী বন্ধু-বান্ধবদের একটা পরিবেশে নিয়মিত সময় কাটানো যায়, সে ক্ষেত্রে কাজটা আরও সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ফেসবুক-আসক্তি থেকে বাঁচার উপায়

আসক্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত একই রকম হয়ে থাকে। পর্নোগ্রাফি-আসক্তি থেকে বাঁচার উপায়গুলো এখানেও প্রযোজ্য। এর পাশাপাশি আরও কিছু বাড়তি অনুশীলন করা যেতে পারে। এসব বিষয় চর্চার দ্বারা আশা করা যায় আসক্তি দূর হবে। আর একেবারে দূর যদি নাও হয়, ধারাবাহিক প্রচেষ্টার দ্বারা ফেসবুক ব্যবহার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

আসক্তি নির্মূলে সবার সমান সময় নাও লাগতে পারে। লাইফস্টাইলের ওপর ভিত্তি করে কারও কারও দীর্ঘ সময়ও লেগে যেতে পারে। তাই এখানে 'ধারাবাহিক প্রচেষ্টা' জারি রাখাটা জরুরি। কয়েকদিন চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিলে তেমন লাভ নাও হতে পারে।

কিছু অনুশীলন হতে পারে এমন :

- নোটিফিকেশনকে গুরুত্ব দেয়া যাবে না। টিং করে ফোন বাজলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। কী ঘটল তা এখনই না জানলে তেমন কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না। ফেসবুকের জটিলতা, প্রাপ্তি (লাইক-শেয়ার), তর্ক-বিতর্ক, সুনাম-অসম্মান এসব কিছুই এমন গুরুত্ব বহন করে না, যার জন্য এত ব্যস্ত হতে হবে। পুরো ব্যাপারটা কিছু মানুষের হাতে সাজানো একটা প্রোগ্রাম ছাড়া কিছুই না। তাই ব্যস্ত হওয়া যাবে না। ফেসবুক-আসক্তি থেকে বাঁচতে নোটিফিকেশনকে তাচ্ছিল্য করা সবচেয়ে জরুরি। দুই-চার দিন ফেলে রাখতে হবে। অলসভাবে নজর বুলাতে হবে। গায়ে মাখা যাবে না। সিরিয়াসলি নেয়া যাবে না। ইচ্ছা করেই অনেক কমেন্ট করা

থেকে, কমেন্টের তর্কের ধারাবাহিকতা জারি রাখা হতে দূরে থাকতে হবে। যেন নিজের কাছে ফেসবুককে গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করা যায়।

- এখানকার প্রাপ্তিগুলোও পর্নোগ্রাফি ও মাদকের মতো মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসৃত করে, যা নিজের ভেতর আরও চাই আরও চাই অবস্থা সৃষ্টি করে। এই মরণ-ফাঁদে পড়া যাবে না। এ চক্কর থেকে নিজেকে বের করতে হবে। করতেই হবে।

- ফেসবুকে স্ট্যাটাস না দেয়া একটা ভালো পরামর্শ। এতে নোটিফিকেশন আসে খুব কম। এটা করতে পারলে কয়েকদিনের মধ্যেই ফেসবুকে তার ব্যস্ততা প্রায় শূন্যে নেমে আসবে। কিছু ঘটবে না, যা তাকে বারেবার এখানে প্রবেশ করতে উৎসাহী করবে। নিরামিষ নিরামিষ লাগবে। এতে মনোযোগ তার লক্ষ্য বদলে নেবে।

- মেসেঞ্জার ত্যাগ করা। এতে মানুষের সাথে যোগাযোগ কমে যাবে।

- ফেসবুক অ্যাপ ইউজ না করা। ব্রাউজার দিয়ে চালানো। অ্যাপ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়। এতে আরও বেশি সময় ফেসবুকে থাকার পথ মসৃণ হয়। ব্রাইজার দিয়ে ফেসবুক চালালে এই প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্ত হয়। প্রতিটি কাজ ঝামেলাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, বিরক্তির সৃষ্টি করে। আগ্রহ কমতে থাকে।

- সুযোগ পেলেই ফোনে হাত দেয়া একটা বাজে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে নিয়েই ফেসবুকে ঢোকা। নোটিফিকেশন চেক করা, মেসেজ দেখা, অলস ও উদ্দেশ্যহীনভাবে স্ক্রল করতে থাকা। কোনো গন্তব্য নেই—চলাই যেন এর উদ্দেশ্য। এ থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

- ইন্টারনেট ডাটা অফ রাখা। যখন একান্ত দরকার তখন চালু করা। নেট অন রাখলে নোটিফিকেশনের শব্দে বারেবার মনোযোগ ফোনের দিকে যাবে। আর কম গতির প্যাকেজ কেনা, ছোট ছোট প্যাকেজ কেনার কথা তো আগে বলাই হয়েছে।

স্মার্টফোন হাতে থাকলে অভ্যস্তদের জন্য ফেসবুক থেকে বেঁচে থাকা বেশ কঠিন। উপকরণ থাকলে মনের টানে ঘুরেফিরে বারেবার চালু করার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই উত্তম উপায় হলো স্মার্টফোন ত্যাগ করা। ইন্টারনেট ব্যবহার বন্ধ করা।

ভিডিও গেইম[৩]

দুঃখজনকভাবে অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি স্মার্টফোনে ভিডিও গেইম খেলাতেও আসক্ত। একটু একটু করে তৈরি হওয়া এই আসক্তি একসময় পাকাপোক্ত জায়গা বানিয়ে নেয়। দেখা যায় প্রচুর সময় এসব গেইমের পেছনে খরচ হয়ে যায়। অনেকে চান এসব থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু হাতে স্মার্টফোন, সাথে আছে বড় প্যাকেজের ইন্টারনেট। চাইলেই কয়েক মিনিটের ভেতর নামকরা-সব গেইম ডাউনলোড করে খেলা যাচ্ছে। একটু অবসর পেলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে খেলা। রাস্তায় জ্যামের ভেতর গেইম খেলে সময় কাটানো হচ্ছে। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে এখানে।

প্রথমত স্মার্টফোন হাতে থাকলে এসব আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আর এর পরেও স্মার্টফোন যদি রাখতেই হয়, সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানের হওয়া ভালো। এর পাশাপাশি ছোট প্যাকেজ ও ধীরগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা—পারতপক্ষে ইন্টারনেট ব্যবহার না করা। নিজের সময়গুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ বরাদ্দ রাখা, যেন গেইম খেলার জন্য সময় না থাকে। অফলাইন ব্যস্ততা বাড়ানো। ফোন হাতের কাছে না রাখা, রাতে ঘুমানোর সময় ফোন নিয়ে না শোয়াও জরুরি। সর্বোপরি আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করা, সময়ের মূল্যায়ন করা। সময় বেহুদা নষ্ট করলে যে আল্লাহর কাছে সে জন্য জবাব দিতে হবে তা কল্পনা করা। গেইমের মতো অযথা কাজে সময় ব্যয় না করার ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প থাকা।

***

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়া যেতে পারে : ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াল সেন্টারের মহামারি, শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, সীরাত পাবলিকেশন।

একজন মানুষ স্মার্টফোন ত্যাগ করার পরেও তার ভেতরকার প্রবৃত্তি যখন জেগে উঠবে তাকে কোনো-না-কোনো উপায় অবলম্বন করে মাঝেমধ্যে গুনাহে লিপ্ত করে ফেলতে পারে। এক-দুইবার এমন হলে শয়তান তাকে বোঝাতে পারে, তুমি আসলে পারবে না। গুনাহ্ থেকে বাঁচা তোমার পক্ষে সম্ভব না। এ-ই তোমার নিয়তি। অতএব আত্মসমর্পণ করে ফিরে এসো। মেনে নাও।

কিন্তু বাস্তবতা হলো হাতে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট না থাকলে তাকে কিছু প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আর প্রতিবন্ধকতা যত বেশি হবে, এর ব্যবহারও তত কমে যাবে।

- প্রবৃত্তির খাহেশ পূরণ করতে হলে তাকে এর বন্দোবস্তের জন্য বেশ ঝামেলা করতে হবে। হাতের কাছে থাকলে যতটা অনলাইনে মত্ত থাকত, হাতের কাছে না থাকলে মাসে তার দশ ভাগের এক ভাগও সময় দেয়া হবে না।

- আস্তে আস্তে অন্যান্য ব্যস্ততা তার এই ব্যস্ততার সময়কে দখল করে ফেলবে।

- হাই স্পিড ইন্টারনেট না থাকলে ব্রাউজ করে মজা পাওয়া যাবে না। এটা অনেক বড় ও কার্যকর একটা প্রতিবন্ধকতা।

এভাবে কয়েক বার হয়তো প্রবৃত্তির চাপে বন্দোবস্ত করা হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে এতে বিরক্তি ধরে যাবে। শেষে প্রবৃত্তিও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অল্পে তুষ্টি এ ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয়। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে ইন্টারনেট সুবিধাবিহীন বাটনযুক্ত ফোনের (ফিচার ফোন) ওপর সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম। নিজের ও পরিবারের আখিরাতের নিরাপত্তার দিকে চিন্তা করে একে যথেষ্ট মনে করতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ এতেই পূরণ হয়ে যাবে। একটা ই-মেইল অ্যাড্রেস রাখা যেতে পারে, যেটা কোনো হঠাৎ-প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এসব টুকটাক প্রয়োজন আগে যেমন বাজারের দোকান থেকে সারা হতো, সেটা এখনো সম্ভব।

একটা কৌশল অবলম্বন করা উপকারী হতে পারে—সব সময়ের জন্য বাটনফোন (ফিচার ফোন) আর শুধু সুনির্দিষ্ট দরকারের ক্ষেত্রে স্মার্টফোন ব্যবহার করা। পকেটে থাকবে ফিচার ফোন, আর আলমারিতে/ড্রয়ারে থাকবে স্মার্টফোন। যখন দরকার হবে স্মার্টফোন বের করে কাজ করা হবে। এরপর আবার সেটি ড্রয়ারে রেখে দিতে হবে। হাতের কাছে না থাকলে কৃত্রিম প্রয়োজনগুলো তৈরি হওয়ার সুযোগ পাবে না। প্রথমে কিছুটা কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে।

কোনো ফিচারকে আবশ্যকীয় ধরে নেয়া যাবে না। শেয়ার ইট অশালীন ভিডিও আপলোড দেয়া শুরু করল, তবু এটা চালাতেই হবে, এমন কিছু না। ব্লু-টুথ আমাদের হাতে আছে। হ্যাঁ, ব্লু-টুথ স্লো, শেয়ার ইট অনেক ফাস্ট। হোক ফাস্ট, কিন্তু এ জন্য গুনাহের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও এটাই চালাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গুনাহের কারণ হয় এমন যেকোনো কিছুকে বাদ দিতে হবে। কী এমন হবে ফাইল ট্রান্সফার না করলে? স্মার্টফোন না চালালেই কী এমন হবে? সত্যি বলতে, কিছুই হবে না।

***

গুনাহ থেকে আমাকে বাঁচতেই হবে। যদি স্মার্টফোন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, বারেবার হোঁচট খেতেই থাকি, আমাকে বুঝতে হবে, হয়তো আমার পক্ষে এসব থেকে বাঁচা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমার আখিরাত তো রক্ষা করতে হবে। আমাকে তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে। এই পৃথিবীতে হয়তো আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াব না, কিন্তু এই তো অল্প ক'টা দিন পরেই তো আসছে সেই দিন, যেদিন আমি আমার মালিকের সামনে দাঁড়াব। কেমন হবে সেই দিনটা? মুখ দেখাব কীভাবে সেদিন?

সে হিসেবে তো ডিভাইস ত্যাগ করাই উত্তম ছিল!

০৭.

শেষ কথা

সমাজে অশ্লীলতা নতুন নয়, পতিতালয়ের অস্তিত্ব নতুন নয়, এমনকি খুব নতুন নয় অশ্লীল ভিডিও দেখার চলও। ছিল বাজে বইপত্রের রমরমাও। এসব ছিল—অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ছিল না এসবের সহজলভ্যতা। চাইলেই যেকোনো সময় সামান্য খরচে মোবাইল ফোনে সব পাওয়া যাবে, সামাজিকভাবে অপমানিত হওয়ার ভয়টুকুও থাকবে না। এর ভয়াবহতা কল্পনাও করা যায় না।

এ সমস্যা রাস্তার বিলবোর্ডের মতো আর পাড়ার মোড়ের দেয়ালে লাগানো সিনেমার পোস্টারের মতো না। নজরের হেফাজতে অভ্যস্ত ব্যক্তি মাথা নিচু করে পার হয়ে যাবে এমন না। মোবাইল স্ক্রিন রাস্তার মতো না যে চাইলেই বেঁচে থাকা যাবে। প্রয়োজনের নামে, বিনোদনের নামে, যুগের খবর নেয়ার নামে, সামাজিকভাবে যুক্ত থাকার নামে আমাদের জীবনের সাথে এই বিপদ জুড়ে আছে।

একজন পরহেজগার ও বুযুর্গ মানুষকে এক স্মার্টফোন অল্প কয়েক দিনের ভেতর পাক্কা ফাসেকে রূপান্তর করে দিতে পারে। বাইরের খোলসটা ঠিক রেখে ভেতরটা দিতে পারে খালি করে। এই মানুষটাকে চোখের জেনা থেকে শুরু করে ধর্ষণের পথেও টেনে নিতে পারে। এটা কেবল সম্ভাবনা নয়, বাস্তবে এ উদাহরণও আছে বহু।

একটা ধারণা এই কারাগার থেকে মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে—এ যুগে ইন্টারনেট ছাড়া চলা অসম্ভব। সামনে এটা আরও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলা যাবে না। কারণ, আমাদের

নগরজীবনের অবস্থা দেখে এমন মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে চিন্তার একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে এমন বিপুল পরিমাণ মানুষ আছে, যারা ইন্টারনেটের ব্যবহার থেকে প্রায় শতভাগ মুক্ত। তাদের ব্যক্তিগত এমন কোনো প্রয়োজন ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল নয়।

পৃথিবীটা অনেক বড়। আমাদের চেনাজানা সমাজ-জীবনের বাইরেও অনেক মানুষ এখানে আছে। অনেক জীবন এখানে অতিবাহিত হয়ে চলেছে। আমাদের আশপাশেই এমন অনেক মানুষ আছে—আর তা সব সময়েই থাকার কথা। অনেক বৃদ্ধ মানুষ, অনেক নারী, অনেক শিক্ষিত মানুষও এমন আছেন, যারা এসবের প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করেন না। যাদের জীবনের মনোযোগ অল্প কিছু বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেখানে অনেক সাধারণ মানুষই স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট থেকে বিমুখ আছেন, সেখানে যে মানুষটা নিজের ঈমান ও আমলকে সব ধরনের ক্ষতি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে চায়, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চায়, আর চায় নিরাপদ একটা কবর, নিরাপদ একটা আখিরাতের জীবন, যে আশা করে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির, তাকে কি বড় কিছু ভালো-লাগাকে কোরবানী করতে হবে না?

একটাই তো আমাদের জীবন। এ জীবনের সময়গুলো অমূল্য। 'অমূল্য' মানে আসলে কী? এটা এমন কিছু, যা জাগতিক কোনো কিছু দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। সময়ের ক্ষেত্রে এই অমূল্য শব্দটা সবচেয়ে বেশি সাযুজ্যপূর্ণ। কারণ, এ সময়গুলো আর কখনোই ফিরে আসবে না। কোনোভাবেই ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই ক্ষতি কোনোভাবে পূরণ হতে পারে না। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সব ক্ষতি যদি বাদও দেয়া হয়, তবু এর সময় নষ্ট করার যে ক্ষমতা, একজন মানুষের জীবনের সম্ভাবনাগুলো শেষ করে দিতে তা-ই যথেষ্ট। এর পাশাপাশি যদি চারিত্রিক ক্ষতিকে যোগ করা হয়, তাহলে আর কীভাবে একজন দুর্বল চিত্তের মানুষের জন্য এটা বৈধ হবে!

গোপন গুনাহ!

গোপন গুনাহ!

গোপন গুনাহের ফল বের হবেই। অনলাইনে গোপন গুনাহের পরিমাণ প্রচুর। চোখের পলকে গুনাহ হয়ে যায়। এক মুহূর্তে অনেক খেয়ানত হয়ে যায়। কেউ জানবে না। কেউ বুঝতেও পারবে না। তবে অবশ্যই জানবেন তিনি, যিনি জানার পর সারা দুনিয়া জানা-না-জানা তেমন বড় কোনো ব্যাপার না।

"অকস্মাৎ মৃত্যু ইসলামে কাম্য নয়। কারণ এটি ব্যক্তিকে কোনো অবকাশ দেয় না। ফলে হতে পারে সে কোনো গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল আর তাওবার আগেই তার মৃত্যু হলো।

সালাফে সালেহীন অশুভ মৃত্যুকে খুব ভয় করতেন।

সাহল তাসতারী বলেন, সিদ্দীকগণ প্রতিটি কাজে ও প্রতি মুহূর্তে অশুভ মৃত্যুকে ভয় করেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত।'"[৪]

গুনাহ প্রকাশ পাবেই। আজ নাহয় কাল, এভাবে নাহয় সেভাবে। মানুষ জানবেই। যত সাবধানতা অবলম্বন করা হোক, প্রাইভেসিতে একদিন-না-একদিন ফাঁক রয়েই যাবে। মানুষের সামনে অপমানিত হতেই হবে। আর হাদীসেও এ কথা আছে :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন পাথরের ভেতর বসেও কোনো আমল করে, যার না আছে কোনো দরজা, না আছে কোনো ছিদ্র, তবু তা প্রকাশ পেয়েই যাবে। ভালো-মন্দ যেমন আমলই হোক।[৫]

আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো কারণে গুনাহ প্রকাশিত নাও হয়, তবুও তো আখেরে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচা যাচ্ছে না। আমাকে তো তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে। তাঁর সামনে দাঁড়াতেই হবে। মুখোমুখি হতেই হবে। হিসাব দিতেই হবে। সেদিন তো আমার জন্য লজ্জা আর লজ্জাই শুধু অপেক্ষা করছে।

---

৪. সুন্দর মৃত্যুর জন্য, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, মাসিক আলকাউসার

৫. শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ৯৫৩

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. বলতেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া দ্রুত বিদায় হচ্ছে আর আখিরাত দ্রুত এগিয়ে আসছে। উভয়েরই রয়েছে কিছু সন্তান। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। সাবধান, আজ শুধু কর্ম, হিসাব নেই। আর আগামীকাল শুধু হিসাব, কর্মের সুযোগ নেই।[৬]

মানুষ আজ জানছে না। কিন্তু আমলনামায় সব লেখা হচ্ছে। কবরে আমাকে কে বাঁচাবে? হায়, কবর তো বড় দুঃশ্চিন্তার জায়গা! বিভীষিকাময় স্থান। সেদিন তো বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না।

কবরের দিনগুলো সম্পর্কে এমন ভাবার কারণ নেই যে, বছরগুলো সিনেমার মতো মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। কবরের সময়টা শুধু দাফন-কাফন আর মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জবাবেই সীমাবদ্ধ নয়। এখান থেকে শুরু হওয়া এই জীবনের দিনগুলোতে যদি—আল্লাহ ক্ষমা করুন—আজাবে গ্রেপ্তার হতে হয়, সময়গুলো কাটানো বড় কঠিন হবে।

সময়গুলো পাঁচ বছর, দশ বছর... এভাবে কেটে যাবে না; বরং এক-একটা মিনিট পার হওয়ার পরে আরেকটা মিনিট আসবে। এক-একটা ঘণ্টা পার হবে বছরের মতো। সকালের পর বিকাল চলে আসবে না। দীর্ঘ একেকটা বেলা, দীর্ঘ একেকটা দিন পার করতে হবে। আর সেই দিনগুলো ঈদের দিনের মতো দ্রুত আর আনন্দে পার হয়ে যাবে না। কষ্টের মুহূর্তগুলো তো শেষ হতে চায় না।

আজাবে গ্রেপ্তার হওয়া মানুষটা কবরে কোনোদিন ঘুমাতে পারবে না। পারবে না সামান্য আরাম করতে। নেই স্বস্তি, শান্তি আর অবসর। ব্যথা নিবারণের জন্য কোনো ওষুধ থাকবে না। কেউ ক্লিষ্ট দেহে হাত বুলিয়ে দেবে না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. তাঁর এক কর্মকর্তাকে বলেন, ভাই, আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—জাহান্নামবাসী চিরকাল নিদ্রাহীন থাকবে। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু স্থির হয়ে যাওয়ার আগেই নিজেকে রক্ষা করো। অন্যথায় তুমি আশাহত হবে।[৭]

---

৬. সুন্দর মৃত্যুর জন্য, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, মাসিক আলকাউসার

৭. মুহাম্মাদ সিদ্দীক আলমিনশাভী, الزهاد مائة (দুনিয়াবিমুখ শত মনীষী)

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব বলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. আমাকে এই বলে সতর্ক করেন, হে ইয়াযিদ, আল্লাহকে ভয় করো। খলিফা ওয়ালিদের লাশ যখন আমি কবরে নামাই, তখন কাফনের মধ্যেই সে ছটফট করছিল।[৮]

আমর বিন মাইমুন বলেন, আমি ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ.-কে বলতে শুনেছি, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেককে যারা কবরে নামিয়েছে, আমি তাদের একজন। তাকে কবরে নামানোর সময় আমি লক্ষ করলাম, তার দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে ঘাড়ের দিকে বাঁকা হয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে তার এক ছেলে বলে উঠল, আল্লাহ, আমার পিতাকে শান্তি দান করুন। হে কাবার রব, আমার পিতাকে শান্তি দান করুন। তার কথা শুনে আমি বললাম, কাবার রবের কসম, তোমার পিতার জন্য সে সময় শেষ হয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. এই ঘটনা বলে মানুষকে উপদেশ দিতেন।[৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, সময়ের অপচয় মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য। কেননা, মৃত্যু তো শুধু দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, কিন্তু সময়ের অপচয় মানুষকে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।[১০]

কুরআনে কারীম বলছে,

আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব।' (জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন,) 'আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি যে তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আজাব আস্বাদন করো, আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[১১]

৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫০৩-৫০৬
৯. তারিখে দিমাশক, ৬৩/১৮০
১০. আল ফাওয়ায়েদ, ৩৬
১১. সূরা ফাতির, (৩৫) : ৩৭

সামনেই তো হাশরের ময়দান, যেখানে বান্দার পা নাড়ানোর সুযোগও থাকবে না, যতক্ষণ দুনিয়ার জীবনে সে কী করে এসেছে সে হিসেব না দেবে। এই তো আসছে কবরের প্রথম রাত। মুনকার-নাকীরের সাথে সাক্ষাৎ তো খুব দ্রুতই হতে যাচ্ছে। ঝুরঝুরে মাটি ফেলে আকাশটা ঢেকে দেয়া হবে। পায়ের শব্দগুলো একটু একটু করে দূরে সরে যাবে। থাকব শুধু আমি। আর আমার দুনিয়াতে করা আমলগুলো। এই নির্জনতায় তারা আমার সঙ্গী হবে। আমাকে সাহস জোগাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপত্তা দেবে।

এই সহজ, সুখময়, আনন্দের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে। অনলাইনের নানারকম মজা শেষ হবে। একইভাবে ফুরোবে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কষ্টও। এরপর তো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর দিন। সেদিন এক পক্ষ আনন্দিত হবে। বলবে, আমি জানতাম এই দিন একসময় আসবে। তাই আমি আগেই সাবধান ছিলাম। আর অপর পক্ষ দুঃখ করবে—আহা, আমিও যদি সাবধান হতাম, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

সূরা হাক্কাহতে আল্লাহ তাআলা এই পুরো চিত্রটা জানিয়ে দিয়েছেন :

১৯. অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে, হে লোকজন, এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো।

২০. আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

২১. সুতরাং সে থাকবে মনঃপূত জীবনে।

২২. সেই সমুন্নত জান্নাতে—

২৩. যার ফল থাকবে ঝুঁকে (নিকটবর্তী)।

২৪. (বলা হবে) তোমরা বিগত দিনগুলোতে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান করো স্বাচ্ছন্দ্যে।

২৫. আর সেই ব্যক্তি, যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে; সে বলবে,

আহা! আমাকে যদি আমলনামা না-ই দেওয়া হতো!

২৬. আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী?

২৭. আহা, মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত![১২]

মহান আল্লাহ আমাদের সে ভয়াবহ দিনের আফসোস থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

---

১২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাকতাবাতুল আশরাফ।

একনজরে পুরো আলোচনার মূল দাওয়াত

- পারতপক্ষে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার না করা।
- যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাটনযুক্ত পুরোনো ধাঁচের ফিচার ফোনের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।
- যারা পেশাগত কারণে ইন্টারনেটে যুক্ত, তারা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যতভাবে ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় সে চেষ্টা করবেন।
- বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে ই-মেইল ব্যবহার করে সমাধানের চেষ্টা করা।
- বাচ্চাদের কোনোভাবেই স্মার্টফোনে অভ্যস্ত হতে না দেয়া।
- যত আগ্রহই হোক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভিডিও কলে কথা বলার অভ্যাস না করা। মোবাইল কলেই সন্তুষ্ট থাকা।
- কারও পক্ষে যদি স্যোশাল মিডিয়া ত্যাগ করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে ইমেজ অফ করে চালানো। অসতর্ক স্ক্রলিং থেকে দূরে থাকা। অলস, উদ্দেশ্যহীন ও সময় কাটানোর জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার না করা।
- প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও সাবধান থাকা। দরকার শেষ হওয়ার সাথে সাথে বের হয়ে যাওয়া।
- স্মার্টফোনকে নিজ ঈমান-আমল, চরিত্র ও আখিরাতের জন্য বিপদ হিসেবে দেখা।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার না করা—এটাই এই পুস্তিকার মূল দাওয়াত। গভীরভাবে চিন্তা করে বের করতে হবে, বাস্তবেই কি এসব আমার জন্য জরুরি? নাকি এটা প্রয়োজনের ওয়াসওয়াসা? আর জরুরি হলেও সেটা আসলে কতটুকু? পরিমাপ করাটা খুবই জরুরি। এটা কি এমন কিছু, যা না হলেই না?

একটা আওয়াজ উঠালে কী হয়—স্মার্টফোন ব্যবহার করব না। নিকটজনদেরও নিরুৎসাহিত করব। এটা কি অসম্ভব? নিশ্চয় না।

হযরত মাওলানা মুশতাকুন্নবী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর এক বয়ানে বলেছেন, (যার সারাংশ,) আমার কেন যেন মনে হয়, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে শুধু এ জন্য ক্ষমা করে দেবেন যে, এই মানুষটা স্মার্টফোন ব্যবহার না করে বাটনফোন (ফিচার ফোন) ব্যবহার করত।

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ হোসাইন। জন্ম আশির দশকের শেষ দিকে। বেড়ে ওঠা ঢাকার উত্তরখানে। বসবাসও এখানেই।

গ্র্যাজুয়েশন করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে। কিন্তু তাকদিরের ফয়সালায় কর্মক্ষেত্র হয়ে গেছে বাংলা সাহিত্য।

প্রকাশনা জগতে তার বেশ কয়েক বছরের বিচরণ। প্রুফ রিডিং প্রিয় কাজ তার। প্রসিদ্ধিও এই পেশাতেই। অসংখ্য বইয়ের প্রুফ দেখেছেন। ভাষা সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছু বইয়ের।

লেখালেখি একসময় ইচ্ছা করেই ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘ বিরতির পর কল্পিত কারাবাস দিয়ে সফর শুরু হচ্ছে। বেশ কিছু বই তৈরিও হচ্ছে। একে একে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পিচ্ছিল এই সময়ে সকল ধরনের পদস্খলন থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন, আমীন।

ছোট শিশুদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে।
বুড়ো মানুষগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্লীলতায় ডুব দিচ্ছে। পর্দানশীন নারীরা দুশ্চরিত্র হচ্ছে। নেককার চোখনিচু মানুষটা রাত কাটাচ্ছে পাপাচারে।
যাকেরীন-শাকেরীন বারেবার হোঁচট খাচ্ছেন। চোখের গুনাহে ডুবে যাচ্ছেন।
বাড়ছে ধর্ষণ!
বাড়ছে কলুষতা।
নুরানি দিলগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কিছুই করার নেই।
টুকটাক সাবধানতা আর তাওবা, এর বেশি কিছুই করার নেই।
সয়ে যেতেই হবে।
বৃদ্ধ পিতার হাতে স্মার্টফোন।
অবুঝ নানির হাতে স্মার্টফোন।
কচি শিশুর হাতেও স্মার্টফোন।
এ থেকে মুক্তি নেই। কিছু বলাও যাচ্ছে না। থামানো সম্ভব না। ইন্টারনেট বড্ড জরুরি আমাদের। এ ছাড়া আর চলছে না। খুব উপকারী।
আহা, এ যেন কারাবাস!
কল্পিত কারাবাস।